আগমনী

দ্বাদশ বর্ষ
১৩৯৮

AGOMONI

1991

আগমনী

১৩৯৮

CONTENTS

Program..3

List of Puja Committee.....................................4

Editorial..5

Puja Committee Chairperson,s Message.......................6

Message from the President of Bichitra.....................7

Message from the General Secretary of Bichitra.............8

সেইদিন একদিন ... ... হর্ষশির রায় 9

আমার বৌদি ... ... মমতাজ মেহেরীন খান 17

আত্মসংকলিত রচনা ... ... মাহমুদুর রহমান 18

একমাত্র ভাবনা কলকাতাতে - কলকথা ... পল্লব সাথী পাত্রীরায় ... .26

শিশুর উপরে আপনার বন্ধুত্বের প্রভাব কতটুকু, জানেন ... সামুলা নেসার ... .28

বুক লেখা ... ... আনোয়ারী খান 32

মুক্তি ... ... আনোয়ারী খান 35

On Being A Bengali in Canada.....Ranen Sinha...............36

Freedom..........................Protiti Khan..............40

Snow.............................Protiti Khan..............40

A Giving Spirit..................H.V.L.....................41

Me and Mother....................Tooki.....................41

The Repairman....................Ranjan Bose...............42

The Lonely Bear..................Nishad Jabeen.............44

A Gift of God....................Shibdas Biswas............45

MOSAIC:made my day at last.......Shibdas Biswas............46

PROGRAM

<u>Sunday, 13th October</u>

MAHASASTHI ------ Bodhan..................3:00 P.M.
Amantran...............4:00 P.M.
Arati..................6:30 P.M.

<u>Monday, 14th October</u>

MAHASAPTAMI ----- Kalparambho.............9:00 A.M.
Mahasnan...............10:00 A.M.
Mahasaptami Puja........10:30 A.M.
Pushpanjali &
Prashad Bitaran.........12:00 Noon.
Bhog, Arati.............12:30 P.M.
Sandhya Bhog Arati.......6:00 P.M

<u>Tuesday, 15th October</u>

MAHASHTHAM ------ Mahasnan................9:30 A.M.
Mahashthami............10.00 A.M.
Pushpanjali &
Prashad Bitarani.........12:00 Noon
Bhog, Arati.............12:30 P.M.
Sandhya Bhog Arati.......6:00 P.M.

<u>Wednesday, 16th October</u>

MAHANABAMI------- Shandi Puja...............9:30 A.M.
Mahasnan................11:15 A.M.
Mahanabami Puja..........11:45 A.M.
Pushpanjali &
Prashad Bitarani..........1:45 P.M.
Bhog, Arati...............2:00 P.M.
Home(Jaggo)...............2:30 P.M.
Sandhya Arati.............7:00 P.M.

<u>Thursday, 17th October</u>

BIJOYADASHAMI-----Puja Bisharjan..........10:00 A.M.
Shanti Path.............11:30 A.M.

<u>Tuesday, 22nd October</u>

KOJAGORI LAKSMI PUJA..........8:00 P.M. -- 11:00 P.M.

<u>PUJA COMMITTEE 1991</u>

Chairperson..........................	Sibdas Biswas
Pratima Transportation.............	Gouri Roy Pratul Biswas Sibdas Biswas
Priest...............................	Ashish Banerji
Decoration...........................	Prabir Mitra Pradip Maiti Pratuk Biwas Rubena Sinha
Puja Jogar...........................	Bhramar Mukherji Debjani Banerji Joya Roy Manju Roy Rubena Sinha Sikha Maiti Sumita Biswas
Food.................................	Kalpana Mitra Sumita Biswas
Fund Raising.........................	Ashoke Sarkar Kamal Malakar Pradip Maiti Radha Das Shibdas Biswas
Cultural Performances..............	Bhramar Mukherji
Puja Invitation.....................	Kunal Banerji Nandita Biswas Shantanu Banerji
Bhog Preparation....................	Pallab Ganguly Ranendranath Sinha Subrato Chakrabarty
General Supervision................	Asim Roy Prabir Mitra Rubena Sinha Sibdas Biswas Sumita Biswas
Editor...............................	Ansari Khan
Sub Editor...........................	Anindo choudhury Shaila Nessar

সম্পাদকীয়

মা-দুর্গার আগমনী উপলক্ষে 'বিচিত্রা'র পক্ষ থেকে এই পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশ করবার দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমি আনন্দিত।

এই পত্রিকায় যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হ'ল তাতে, অল্প হলেও, প্রবাসী জীবনের অনুভূতির ছোঁয়া রয়েছে। মন ও বাইরের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে মাত্র কয়েকদিনের জন্য হলেও এই শারদ উৎসবের দিনগুলোয় যদি আমাদের বিক্ষিপ্ত চিন্তাবলী বাঙলার ধানপাকা মাঠে দু'দণ্ড মেঘের পাখনায় মিশে হাওয়ায় ভাসতে পারে - কয়েক মুহূর্ত যদি শোনা যায় দোয়েলের গীত -মনের গভীরে - তবে এই উৎসবের আয়োজন সার্থক হবে।

অনেক ভুলত্রুটি রয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত বাঙলা টাইপ ব্যবহার করতে পারিনি - প্রিন্টারের সমস্যার কারণে। আমাকে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ - যাঁরা করেননি তাঁরা ভবিষ্যতের সম্পাদককে করবেন বলে আশা করি।

দুর্গা-মায়ের আগমনের এই খুশীর দিনে প্রার্থনা করি- আমাদের মঙ্গল কর মা - অন্তর ও বাইরের।

(আনোয়ারী খান)

MESSAGE FROM THE CHAIRPERSON OF DURGAPUJA COMMITTEE

It is a pleasure to extend greetings and best wishes on my behalf and my family on the occasion of the 12th anniversary of the Durgapuja, held at the temple. Other than the religious part and practice, Mother's advent brings hope, prosperity, happiness and things that allow people forget their past differences and misunderstanding bringing them more close socially or otherwise. They share common concerns,goals and happiness under the same umbrella.I am personally thankful to the executive of the Hindu Society and the members of the Hindu Community , who have gracefully embraced this annual event as their own by sharing and participation. This is our strength. Bichitra, particularly is grateful to the Executive body, who have given the temple for use for a common cause. Once again, I take this opportunity to welcome you all and wish you a very happy and prosperous year.

Shibdas Biswas
Chairperson
Durgapuja committee,1991

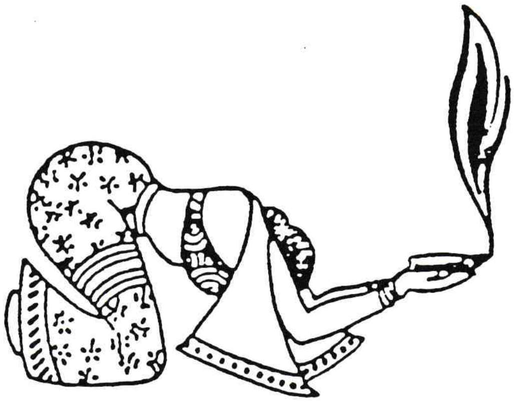

MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF BICHITRA

প্রেসিডেন্ট তাঁর বানী প্রদানে অক্ষমতা
প্রকাশ করেছেন।

সম্পাদক

MESSAGE FROM GENERAL SECRETARY OF BICHITRA

Durga Puja is the premiere festival of Bengal. It is a time of joy and celebration. On behalf of 'Bichitra' I would like to welcome you all to participate in this year's festivities.

On this occasion let us take a break from the tedium of life and enjoy the peace and happiness which Ma-Durga brings amongst us.

I would like to express my gratitude to all those who have been involved in making this, the twelfth Puja in Winnipeg a success.

Debjani Banerji

Debjani Banerji
General Secretary
Bichitra

সেইদিন একদিন

শিশির রায়

"কিংশুক .... এই কিংশুক।" হঠাৎ করে তরুণী কন্ঠে আমার একান্ত আপন নামটা শুনে থমকে দাঁড়ালাম। তাকিয়ে দেখতে যাব, একটা কালো এম্বাসাডর অকারণ জোরে হর্ন দিয়ে হুস করে সামনের রাস্তার থেকে বাঁ-দিকে বাঁক নেবার জন্য সশব্দে ব্রেক কষে দাঁড়াল, একেবারে আমার নাকের ডগায়। একটা লোককে শুধু দেখলাম গাড়ীর সামনের থেকে ছিটকে সরে যেতে। এলিটের সামনে বাস থেকে নেমে মিনার্ভার সামনের ফুটপাত ধরে হেঁটে আসছিলাম। উদ্দেশ্য দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিয়ে ম্যাটিনি শো'তে একটা ইংরাজী সিনেমা সেরে দেওয়া।

বরানগরের বস্তি-ডেভেলপমেন্টের কাজটা মোটামুটি ভালই এগুচ্ছে এখন। সাইটের ছোঁড়াটাকে টুকিটাকি নির্দেশ দিয়ে একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়েছিলাম। অনিমেষকে বলেছিলাম সন্ধ্যের দিকে ওর বাড়ীতে যাব। সোমবার দুর্গাপুরে ফিরে যাওয়ার আগে রিষড়ার কাজটা শুরু করার ব্যাপারে ও'র সাথে কথা বলা দরকার আর সময় থাকলে মুক্তাঙ্গনের সামনে কিছুক্ষন আড্ডা দেওয়া'ও যাবে। ওর প্রতাপাদিত্য প্লেসের বাড়ী থেকে মুক্তাঙ্গন খুব কাছেই। অনিমেষ অবশ্য প্রতিবারই আমাকে বাসে তুলে দিতে আসে। ও'র আবার সুগন্ধি জর্দা দিয়ে পান খাওয়ার খুব নেশা। মুক্তাঙ্গনে ঢোকার মুখে বাঁ-পাশের পানের দোকানটা ওর খুব প্রিয়। জায়গাটা আমার প্রিয় অবশ্য অন্য কারনে। সন্ধ্যার পর রাসবিহারীর পাঁচ-মাথা মোড়ের কোলাহল কাঁটিয়ে এই থিয়েটার হলের সামনেটুকু, সাদার্ন এ্যাভিনুর হঠাৎ করে থমকে যাওয়া নিস্তব্ধতার মাঝে মনে হয় প্রানবন্ত এক রূপসী কন্যা। অদ্ভুত এক আলো আঁধারিতে ঘেরা ছোট্ট এই জায়গাটুকু। কাছ থেকে ভেসে আসা মৃদু গুঞ্জন, তরুণী-কন্ঠের কলহাস্য, শাড়ীর খসখসানি, চুড়ির রিনিঝিনি, রজনীগন্ধা আর সস্তা-দামী পারফিউম এর মিশ্র-মিষ্টি সুবাস, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ভাজা চপ আর তেলেভাজার গন্ধের সাথে মিশে একাকার, যেন নেশা জাগানোর নেশা।

বন্যা কাল অনিমেষের ফোনের মাঝেই বলে উঠেছিল ও কি একটা বিশেষ খাবার বানাবে আজ তাই ওদের বাড়ী যেতে যেন না ভুলি। বন্যা অনিমেষের বড় বোন, মেডিক্যাল এর ছাত্রী। আমার সাথে ওদের বাড়ী আসা যাওয়ার মাঝে দু'একবার কথাবার্তা হয়েছে, তবে বিশেষ করে কিছু না। ইদানিং অনিমেষের সাথে আড্ডা মারার

ফাঁকে মাঝে মাঝেই অকারণে ঘরে ঢোকে। অযাচিতভাবেই জিজ্ঞাসা করে আর চা খাব কিনা, অন্য কিছু লাগবে কিনা। ব্যাপারটা আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না। একটু তলিয়ে দেখতে হবে। আমার আবার ডাক্তারী পড়া মেয়ে একেবারেই পছন্দ নয়। এমনিতেই বাড়ীর মোটামুটি সবাই ডাক্তার। বাবা কারণে অকারণে সুযোগ পেলেই আমাদের ভাই-বোনেদের ধরে ধরে ক্যালসিয়াম আর বি-টুয়েলভ ইঞ্জেকশন দিয়ে ছাড়ত। এর উপর টনিক। বড়ি আর লাল-নীল জলের 'উপদ্রব'ত আছেই। সেইজন্যই বোধ হয় ডাক্তারদের ব্যাপারে ছেলেবেলা থেকেই কেমন জানি একটা এলার্জিক ভাব গড়ে উঠেছিল। ছিপছিপে গড়নের হলেও বন্যার গায়ের রঙটা আবার শ্যামলা - যেটা আমার রঙ-পছন্দের তালিকার শেষ আইটেম। অথচ এই আমিই ছোটবেলার থেকে শ্যামা সঙ্গীত আর শ্মশান-কালীর ভক্ত। সুযোগ পেলেই কালীঘাট-দক্ষিনেশ্বর করে বেড়াই। আমার কি দোষ বল মা। তোমার বাঙালী সন্তানরাই'ত তোমাকে ন্যাংটা করে হাতে নর-মুণ্ড আর খড়্গ ধরিয়ে শ্মশানে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঘর দিয়েও ঘর করার সুযোগ দেয়নি, এমনকি একটা ছেলেমেয়েও দেয়নি যে তোমার দুঃখের দিনে তোমায় একটু দেখবে। এদিকে তোমার সতীন পারুকে যেই দেখেছে ফর্সা-টুকটুকে, টানাটানা চোখ, লম্বা-সোজা নাক অমনি বেনারসী আর গয়না দিয়ে সাজিয়ে চার-চারটে রাঙা-টুকটুকে ছেলেমেয়ে দিয়ে দিব্যি করে একবার বাপের বাড়ী ঘুরিয়েও আনছে। জটাজুটো-ধারী নামেই তোমার স্বামী বুড়োটা জাতে মাতাল হলে হবেকি তালে ঠিক আছে। ফর্সা-কালোর জ্ঞান একেবারে টনটনে। আবার তোমাকেই দিয়েছে সবচাইতে কঠিন কাজ - তোমারই নিজের লোকের মুণ্ডু একেবারে ঘ্যাচাং ঘ্যাচ করে কাটার। আর অস্ত্র বলতে 'ত ঐ খড়্গই সার। অথচ দেখ পারুকে দিয়েছে হাজার-শত অস্ত্র আর সহজ কাজ - তোমার স্বামীর একটা কালো শত্রুকে শুধু নিপাত করা, তাও ভদ্রভাবে। সবই মা তোমার ইচ্ছা। তবে হ্যা, একটা মানতেই হবে মা তোমায়, ভক্তি-টক্তি যা, সব তোমাকেই করে। ঘরে তুমি, বাইরে তুমি, দোকানে তুমি বাজারেও তুমি, ঘাটে তুমি আঘাটায় তুমি, মন্দিরে তুমি শ্মশানেও তুমি, জীবনে তুমি মরণেও তুমি, এক কথায় নও'মা তুমি আর সর্বত্রই তুমি মা। রাগ করো'না মা, পারু'কে 'ত ঐ একবারই বছরে স্মরণ করি।

এদিকে দেখে নিয়েছি 'ম্যাটিনি শো' চলছে। কিছু লোকের ভীড় দেখলাম, তবে খুব বেশী নয়। অবশ্য পঁয়ষট্টি পয়সার লাইনটা ইতিম(ধ্যে)ই বেশ জমে উঠেছে। আগে আমরা ওটা দশ-আনার লাইন বলতাম। সিনেমায় একটা নাম-না-জানা সস্তা সুরসুরি-মার্কা

ইংরাজী সিনেমার সাইনবোর্ড দেখলাম। হাঁটতে হাঁটতে ভেবেছিলাম নিজামে যাব কিনা। ওরা মাটন-রোলটা বেশ বানায়। কোকের সাথে বেশ জমে। দূর-ছাই, ভুলেই গিয়েছিলাম, ইন্দিরার স্বদেশীয়ানার চোটে কোক'ত আবার এখন মেলে না। আমার আবার দেশীয় ফান্টা-টান্টা কিরকম পানসে লাগে। মত পাল্টে নিউ-মার্কেটের দিকেই রওনা দিয়েছিলাম। নিরুলা'র মাটন-চপ আর চিংড়ী-কাটলেটটা মন্দ না। কফির সাথে তাড়িয়ে তাড়িয়ে খেতে বেশ ভালই লাগে।

রাস্তায় এখন বেশ ভীড়। অবশ্য শনিবারের দুপুর। পুজোর এখনও দেড়-মাস বাকী। মনে মনে ভাবছিলাম হিসেবী লোকজন কি এখনই বেরিয়ে পড়েছে, কেনাকাটার লোভে। অবশ্য পুজো না থাকলেও মধ্য-কলকাতার এই অংশটা কলকাতা চোরপরেশন থুড়ী কর্পোরেশন, নিউমার্কেট, হরেক রকম বিদেশী কালোবাজারী দোকান, ইংরাজী সিনেমা, নানান রকম দেশী-বিদেশী খাবার এর রেস্তঁরা এবং বিদেশী পানীয়'র দোকানের দৌলতে আর পাঁচতারা, এক-তারা হোটেলের দেশী-বিদেশী অতিথিদের কল্যানে ভীড় সবসময়েই। চলতে গেলে গায়ে গা লাগে। হিন্দুস্থানী ঝাঁকা-মুটে, কর্পোরেশন আর আশে-পাশের অফিসের লোক, পেটমোটা মাড়োয়ারী, কিছু অলস নির্বিকার পেট-বুক খোলা সুপ্তমনা দেখলে বোঝা মুশকিল কোন জাতের, তারই ভেতর কিছু রুচি জ্ঞান সম্পন্ন আধুনিক আর ইংরাজী সিনেমায় সাদা-চামড়ার সাহেব-মেমদের সস্তা যৌন চলাচলি দেখার লোভাতুর আকাঙ্খা নিয়ে স্কুল-কলেজ পালানো আর বেকার কিছু ছেলেমেয়েদের ভীড়। বাঁ-পাশের কর্পোরেশন এর পোর্টিকোতে কেউ একজন বক্তার নামে মাইকের সামনে হাত-পা ছুঁড়ছে। কোন চোর কাউন্সিলার বা এম.এল.এ হবে হয়ত। আরো বৃহত্তর চুরির আগে জনমানুষী করা আর কি। ঝান্ডা তুলে কিছু লোক বক্তাকে ঘিরে, দেখাও যাচ্ছে। রিকশার ঠুন্‌ঠুন্‌ শব্দ, গাড়ীর প্যাঁ:-পোঁ, মটরের ঘরঘরে আওয়াজ এবং চারদিকের ব্যস্ত-অলস কোলাহলের ভেতর থেকে ডাকটা শুনলাম। এদিক ওদিক তাকিয়ে চোখ পড়ল রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়ানো সুবেশা এক তরুনীর দিকে। চোখে সানগ্লাস পরা, ডান হাতটা উঁচু করে নাড়ছে আমারই দিকে। চোখে চোখ পড়ল কি পড়ল না, তক্ষুনিই হেসে উঠল, কিছু বলেও উঠল মনে হয়, শুনতে পেলাম না। খুকু না। হ্যাঁ খুকুই'ত! এখানে, ... এ সময়, ... ও'ত এখন, ... এইসব ভাবতে ভাবতে নজর গেল ওর বাঁ হাতে ধরা অনেকগুলো

রঙ-বেরঙের কাগজের হাতলওলা ব্যাগ, ভেতর থেকে উঁকি মারছে রঙীন কাগজে মোড়া কিছু প্যাকেট। বোঝাই যায় সদ্য কেনা কাপড়-জামা।

“কিরে চিনতে পারছিস্ না নাকি!” কখন টুক করে রাস্তাটা পেরিয়ে ওর কাছে পৌঁছে গেছি খেয়াল করিনি। হাল্কা গোলাপী রঙের শাড়ীটা ওর দেহের সাথে মিশে গেছে। গলায় রুদ্রাক্ষের বীচির মত দেখতে পুঁতির একটা মালা ঝুলে আছে বুক ছাড়িয়ে নাভী-প্রদেশ পর্যন্ত। কপালে মস্ত এক টিপ, শাড়ীর রঙে রঙ মিলিয়ে। যত্ন নিয়ে শ্যাম্পু করা ঘন কালো এলোমেলো ঢেউ খেলা চুলগুলো পিঠের দিকে ছড়ানো। বাতাসে ঝিরঝিরে একটা গরম হাওয়া, তাতেই কানের পাশের চুলগুলো ঝিরঝির করে কাঁপছে। বাতাসে একটা মিষ্টি সুবাস ওর চুলের না দেহের থেকে বোঝা গেলনা। কানে কিছু পরা আছে কি নেই দেখা যায় না। কয়েকটা চুল কপাল ছাপিয়ে মুখের ওপর এসে পড়েছে — বোঝা গেলনা ওগুলো ইচ্ছার কিনা। চুলের ফাঁক দিয়ে দেখা যাওয়া না যাওয়া সিঁথির লাল রঙটা স্পষ্ট না হলেও এখান থেকে বেশ বোঝা যায়। কালো সানগ্লাস এর ভেতর দিয়ে ওর চোখদুটো দেখবার চেষ্টা করলাম। দেখা না গেলেও বুঝলাম ও তাকিয়ে আছে, বড় বড় চোখ মেলে, আমারই দিকে। ওর ছোট্ট-পাতলা নাকের দুপাশের খাঁজে দু'টি স্বেদবিন্দু মুক্তোর নাকছাবি হয়ে যেন আটকে আছে। গায়ের জামাটা খুব রুচিসম্মত ভাবে আধুনিক। ডান হাতে দু-গাছি চিকন চুড়ী, সোনারই হবে বোধহয়। বাঁ-হাতে শুধু একটা সৌখিন সোনালী রঙের সুন্দর ঘড়ি। পায়ে শান্তিপুরী কাজ করা সৌখিন চামড়ার চটি। সবকিছু মিলিয়ে এক পরিচ্ছন্ন রুচিশীল আধুনিকতা। সাজ-সজ্জায় ও বরাবরই উদাসীন ছিল। পরিবর্তন লক্ষনীয় হলেও সেই খুকুকে চিনতে একটুকুন কষ্ট হচ্ছে না আমার। মনে মনে প্রশংসা না করে পারলাম না, প্রায় বলেই উঠেছিলাম, বেশ সুখেই আছিস তাহলে! কিন্তু মুচকি হেসে বললাম, “তুই কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছিস আজ, খুকু।” আর মনের গভীর কথা কয়ে উঠল যেন আমার মন, “তুমি ত আমার অচেনা নও, তুমি যে আমার জন্ম-জন্মান্তরের .... যুগ-যুগান্তরের .... মানসী আমার, প্রিয়া আমার” হঠাৎ খেয়াল হল, এই কি সব ভাবছি। বাংলা ভাষার এ একটাই দোষ। ভাবাবেগের কথা বলতে গেলেই যেন কিরকম নিজের কানেই সেকেলে সেকেলে লাগে। কেমন যেন ন্যাকামো ন্যাকামো ভাব।

অথচ অন্য উপায়ই বা কি আছে। জানিনা, অন্যেরা কি ভাবে বলে বা ভাবে। একমুখ হাসি নিয়ে আবার ও জিজ্ঞাসা করল, "মার্কিস কোথায়?" উত্তর দেবার আগেই পেছন থেকে জোর এক গুঁতো খেলাম। ওর ওপর প্রায় হুমড়ে পড়ছিলাম আর কি। খুব সামলে নিলাম। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম "এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না কি! এখনও খাওয়া হয়নি আমার। চল কোথাও বসে খেতে খেতে কথা বলা যাবে। তোর সাথে আর কেউ নেই ত!" কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, আমি ওর ব্যাগশুদ্ধ বাঁ-হাতটা খপ করে ধরে ফেললাম। বললাম, "দে ওগুলো আমাকে।" না, না করে উঠল ও। "এমন কিছু ভারী নয়, শুধু কিছু জামা-কাপড় আছে।" আমি আর কথা বাড়ালাম না। হাতটা ছেড়ে দিয়ে, হাঁটা দেবার জন্য মুখ ফেরালাম। মনে মনে আশ্চর্য হলাম; এতদিন পরে হাত ধরলাম, কই কিছুত অনুভব করলাম না! তবে কি আমার মন কখন নীরবে মেনে নিয়েছে; ও আর আমার কালের নয় শৈশবেরও নয়, তারুণ্যের নয় যৌবনেরও নয়, প্রৌঢ়ত্বের নয়, বার্দ্ধক্যেরও নয়। আচ্ছা! ও কি কিছু অনুভব করেছে! ..... মনেত হল না!

অল্প একটু এগিয়ে বাঁ-পাশে হাঁস-মুরগীর দোকানগুলো আর ডানপাশে হরেক রকম ডল-পুতুল আর কাগজের ফুলের দোকানগুলোর মাঝখান দিয়ে টুক করে নিউমার্কেট-এ ঢুকে পড়লাম। জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছিস।" বললাম, "কাদশায়। ওটা এই সময় ভীড় থাকে না - আর বেশ নিভৃত।" দু'পাশের দোকানগুলোর মাঝখানের সরু রাস্তা দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম, গ্লোবের পাশের রাস্তাটার গেটের দিকে। খুব ভীড় না হলেও সব দোকানেই দু'একজন খদ্দের লেগে আছে। আগে এখানে শুধুই কিছু বড়-লোকের বউ, দেশী-বিদেশী মেমের দল, আর ঘুষ খাওয়া কিছু হোমড়া-চোমড়া সরকারী অফিসারদের বউরা আসত। ইদানিং অনেক মধ্যবিত্ত ঘরের বউ মেয়েরা আসা যাওয়া করছে। বোধহয় ওরাও ধরে ফেলেছে নিউমার্কেটের বাজারের রহস্য। দেখে ত' মনে হয় দোকানীরাও খুশী, এই পরিবর্তনে।

যেতে যেতেই বলে উঠলাম, প্রায় স্বগতোক্তির মত, "চার বছর পারে না!" কিছু শোনা বা বোঝবার আগেই আমার বাঁ-পাশের দোকান থেকে একজনকে উর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে এসে উল্টোদিকের দোকানে ধাঁ করে ঢুকে যেতে দেখলাম। আবার তার ওপর পড়তে পড়তে টাল সামলে নিলাম। ওইটুকুন সময়ের ভেতরই দেখে যতটুকুন

মনে হল, এক মহিলাই হবে। অর্দ্ধনগ্ন, জামা পরা আছে কি নেই, শাড়ীটা দেহ থেকে ঝুলছে - কি ঝুলছে না। খুকু কি যেন একটা উত্তরে বলল, আমার কানে গেল না। দেখি, রাস্তা পেরিয়ে কখন বাদশাহ্ এসে পড়েছি। ডানদিকে জহরলাল নেহেরু রোডটা পার করে দূরেই শহীদ মিনার ছাড়িয়ে দূরে আরও দূরে ইডেনের গাছ-গাছালির মাথায় মিশে যাওয়া নীল আকাশে আটকে যায়। বাঁ-দিকে বেশ কিছুটা এগিয়ে ফ্রি-স্কুল-স্ট্রিট, আরও কিছুটা আগে গ্লোব। রাস্তার এপাশ থেকে বোঝাই যায় না যে ওখানে একটা সিনেমা হল আছে। গ্লোব আমার খুব প্রিয় সিনেমা হল। ওদের ইংরাজী সিনেমাগুলো সচরাচর রুচিসম্পন্ন। আমরা বাদশাহ্ ঢুকে সোজা দোতলায় উঠে কোনের দিকের একটা টেবিল দেখে বসে পড়লাম। জায়গাটা বেশ অন্ধকার অন্ধকার ভাব, শুধু টেবিল এর ওপর মৃদু স্পট-লাইট। প্রথমে বোঝাই যায় না অন্য টেবিলে লোক-জন আছে কিনা। জায়গাটা বেশ ঠান্ডা, অনেকক্ষন রোদ্দুরে হাঁটার পর বেশ আরাম লাগছে এখন। খুকু একেবারে বলে উঠল, "অনেকদিন পর তোর সাথে দেখা হয়ে বেশ ভাল লাগছে রে!" ওঠবার সময় কাউন্টারের লোকটাকে দু' গ্লাস লস্যি দিতে বলেছিলাম। বয়বার প্রায় সাথে সাথেই এসে গেল। লোকটা যাবার আগে মেনু-কার্ড দিয়ে বলল ও একটু পরে এসে অর্ডার নিয়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি খাবি?" ওর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকেই বললাম, "এদের চিকেন-কাবাবটা খুব ভাল, সঙ্গে ফ্রায়েড-রাইস নিয়ে নিই, কি বল!" ও আর কিছু বলল না, এতক্ষনে বোধহয় বুঝে গেছে আজ আর ওর কোন কথা শুনব না। কলেজ জীবনের ব্যস্ততা-অবসরের মাঝে যখন কদাচিত দেখা হ'ত, কথা শেষে আমাকে মনে করিয়ে দিত, তুই কিন্তু এখনও তোর ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তির খাওয়াটা খাওয়ালি না। মজা করে ও ওটা বলত কিনা জানিনা, তবে ওটা ওর পাওনা রয়ে গেছে আমার কাছে। আমি আর ওটা ওকে মনে করিয়ে দিতে চাইলাম না, এই মুহূর্তে। জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে যে বড়!" বলল গত সপ্তাহে বালেশ্বর থেকে শ্রীরামপুর এসেছে। বাবার শরীরটা খুব খারাপ.... এখন একটু ভাল আছে। প্রশান্ত সঙ্গে এসেছিল। পরের দিনই চলে গেছে, ব্যবসার নাকি ক্ষতি হবে। আজ সুযোগ পেয়ে, মেয়ে দুটোকে মায়ের কাছে রেখে বেরিয়ে পড়েছে। আরও সব কি বলছিল, আমি আর কিছু শুনছিলাম না। শুধু ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

লাস্যিটা শেষ করে কখন একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছি। কয়েকটা টান দেবার পর বেশ একটা আমেজ অনুভব করলাম। মনে হচ্ছে এই ত সব সেদিনের ঘটনা। হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা সবে শেষ হয়ে গেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তির পরীক্ষাও দেওয়া হয়ে গেছে। হাতে তখন অফুরন্ত সময়। আড্ডা, খেলে, ঘুমিয়ে, শুয়ে বসে দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছে। এরই মাঝে টুকটাক এখানে ওখানে ভর্তির ফর্ম ফিল-আপ করছি। একদিন, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-ই হবে বোধহয়, ফর্মের মেডিক্যাল চেক-আপ এর ডাক্তারী অংশটা সই করবার জন্য এক সন্ধ্যায় আমি ওদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য মুখার্জী-মেসোমশাইকে বলে ওনার একটা এপয়নমেন্ট নেওয়া। মেসোমশাই তখন পোর্ট-কমিশন-এর ডাক্তার। দোতলার সিঁড়িতেই ওর সাথে দেখা। বলল, "কি ব্যাপার, ইন্দ্র।" আমি বললাম, "মেসোমশাই-এর সাথে একটু....।" কথা শেষ করবার আগেই, বলে উঠল, "তোর সাথে পরে কথা বলব রে।" বলেই তরতর করে নেমে বাইরে চলে গেল। "খুকু" বলে চিৎকার করে ডাকতে গিয়েও ডাকলাম না। সেই ইংরাজী পরীক্ষার দিনটির পর আজ এই প্রথম ওর সাথে দেখা। শুনেছিলাম আজকাল সবসময়ই বাড়ীতে থাকে। খুব জরুরী না হলে বাড়ীর বাইরে যায় না। তবে কি ও আমায় দেখেছে ওদের বাড়ীতে ঢুকতে! ও'কি সন্দেহ করে যে আমি সব জানি। তাই যদি হয়, ওর এত সংকোচ কেন আমাকে! আমিত ওর দুই'ত ভাইয়ের বন্ধু। ভাবতে ভাবতে কখন ওপরে উঠে এসেছি। বারান্দায় বুবুর সাথে দেখা। মনে হল কারো জন্য অপেক্ষা করছে। ওর গানের মাষ্টার মশাই-এর জন্য হবে বোধহয়। শুনেছি ও আজকাল ক্লাসিক্যাল এর দিকে ঝুঁকেছে। গলাটা খুকুর মত অত ভাল না হলেও বুবু রবীন্দ্রসংগীত খারাপ গায় না। বুবুর সাথে আমার তখন কথাবার্তা প্রায় বন্ধ। অনেক বছর আগে আমরা যখন চিন্তা-গরম, বউ-বসন্ত খেলতাম, তখন আমার একটু ছেলেমানুষী দুষ্টুমিতে রেগে গিয়ে ও সেই যে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল, তারপর থেকে আমরা আর কিছুতেই সহজ হতে পারিনি। খুকু অবশ্য অনেকবার চেষ্টা করেছিল। ভাবলে আজ হাসি পায়। ছেলেমানুষী সেই সব দিনের কথা। বুবু আমার মেজ বোন 'ঝিনুক'এর খুব বন্ধু। ওরা পরের বছর স্কুল-ফাইনাল দেবে। ওদের স্কুলটা আর হায়ার-সেকেন্ডারী হয়নি। আজকাল প্রায়ই আসে আমাদের বাড়ীতে। ইচ্ছা করে আমার সাথে কথা বলে না। আমিও বলি না। ও আমার দু'বছরের ছোট হবে।

বারান্দায় চোখাচোখি হতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করলাম, মেশোমশাই আছেন কিনা। কোন কথা না বলে, আঙুল দিয়ে ঘরটা শুধু দেখিয়ে দিল। উঁকি দিয়ে দেখলাম অন্য ঘরটাতে মুকু কে কে যেন পড়াচ্ছে। মুকু ওদের সব থেকে ছোট বোন। ক্লাস টু না থ্রী 'তে পড়ে বোধহয় এখন। ফিরে আসবার সময় মাসিমা কিছুতেই ছাড়লেন না, মিষ্টিমুখ করিয়ে ছাড়লেন। কি সব করছি এখন, ডাক্তারী না ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব, এইসব নানান প্রশ্ন করছিলেন। কল্যাণ কামনা করলেন স্বাভাবিক নিয়মেই। কিন্তু মাসিমা বা মেশোমশাই কেউ একবারও খুকুর নাম নিলেননা।

হঠাৎ কাঁধে একটা ঝাঁকুনী খেয়ে তাকিয়ে দেখি আমার বাঁ-পাশে খুকু দাঁড়িয়ে, ডান হাতটা আমার কাঁধের ওপর আর মিটি মিটি হাসছে।

"খেতে খেতে কতবার তোকে ডাকলাম। কোন সাড়াই দিলিনা! কি এত ভাবছিস বলত তখন থেকে। কিছুই ত খেলিনা! শুধু সিগারেট ধরিয়েই যাচ্ছিস। আমাকে কিন্তু এখনই যেতে হবে। ৪-৫৬ মি: এ শ্রীরামপুর লোকাল। খাওয়া শেষ কর চটপট।"

ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি ৪টা বেজে গেছে। নীচে নেমে বিল মিটিয়ে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। কিছুটা এগিয়েই একটা ফাঁকা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। খুকু বলে উঠল, "তোর সাথে তো কিছুই কথা হ'লনা। এই শনিবার চলে আয় না শ্রীরামপুর। প্রশান্ত আসবে।" বললাম "দেখি।" ততক্ষনে ট্যাক্সিটা খুকুকে নিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ময়দানের দিক থেকে প্রচণ্ড কোলাহল ভেসে এল। লীগের আজ বড় খেলা ছিল, মহামেডান আর বি. এন. আর এর। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে ময়দানের দিকে হাঁটা দিলাম।

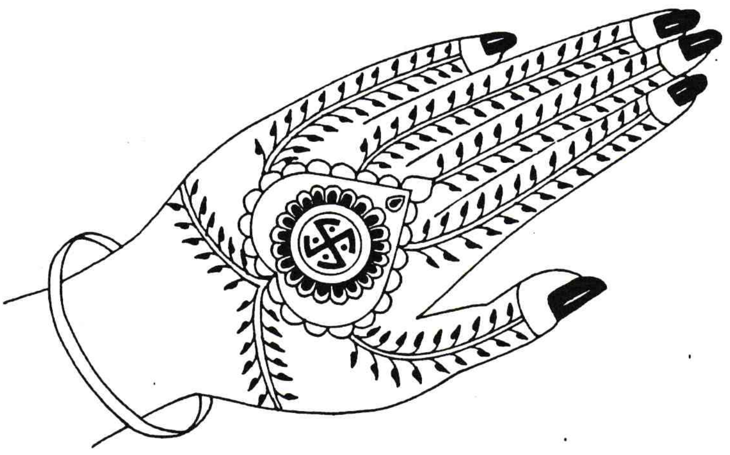

আমার বোধ

মমতাজ মেহরীন খান (শিলি)

ইদানিং আমার অহমিকার বোধ
হোঁচট খায় পথ চলতে পথে।
বাস্তবতার কঠিন দেয়াল ভেঙে
পথ হাঁটি।

তবুও — আমার ভালবাসা
ত্রস্তপায়ে হরিনীর মতোন পালায়।
ঠিক তখনই — তোমার ছবি প্রতিবিম্বিত হয়
নদীর স্বচ্ছ জলে।

আকাশ আর মাটির সীমারেখা
আমার জানা নেই।
কোন ভৌগোলিক বলতে পারেনি আমায়
আকাশ আর মাটির প্রভেদ
কতটুকু।

তাই, আজও আমি — তোমার কাছে
পারিনি পৌঁছোতে।
যেদিন — মাটির সোঁদা গন্ধে
ভরে উঠবে আমার হৃদয় —
আবার দেখা হবে — সেদিন —
কোন এক সবুজ ছায়ায় —
শান্ত নীড়ে।
আমার বিশ্বাস, আমার বোধ —
আমার অহংকার —
খুঁজে পাবে তোমাকে আবার।

আত্মসম্পর্কিত চিন্তা

মাহমুদুর রহমান

"নিজেকে জানো" বলেছিলেন সক্রেটিস আজ থেকে কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীক সভ্যতার যুগে। মানুষ তার জ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে জানতে পেরেছে সৌরজগত ও তার পরিবেশের অনেক তত্ত্ব, কিন্তু আজো জানতে পারেনি তার নিজেকেই। মানুষ যেমন বিজ্ঞানের উন্নতিতে রকেটে চড়ে চাঁদে গিয়ে পৌঁছেছে। মেরিন টেকনোলজি দিয়ে খবর পেয়েছে সাগরের তলদেশের রহস্য। এস্ট্রোনমি ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশকে কাজে লাগিয়ে খবর পাচ্ছে দূর দূরান্তের গ্রহনক্ষত্র সম্পর্কে। মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে তার পরিবেশের উপর দখল বাড়ছে দিন দিন। এতকিছুর পরও মানুষ তার নিজের সম্পর্কে কতটুকু জেনেছে? প্রকৃতিকে জানা যত কঠিন নিজেকে জানা হয়তোবা তার চেয়ে আরো কঠিন। কারন, প্রকৃতিতে একটা নিয়মের রাজত্ব চলছে। কিন্তু মানুষের চলার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম আছে কি? আছে কি মানুষের অনুভূতি বা চিন্তার জগতে কোন নিয়মের রাজত্ব? অনিয়ম কিংবা জটিল নিয়ম যদি কিছু থেকেও থাকে সেটাকে মানুষ দেখবে কোন্ অনুবীক্ষন যন্ত্র দিয়ে, সেটাকে মাপবে কোন্ ব্যারোমিটার দিয়ে কিংবা বিশ্লেষন করবে কোন্ কম্পিউটার দিয়ে? নিজেকে সত্যিকারভাবে জানার সমস্যা অনেক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গানে বেজে উঠেছে নিজেকে জানার সমস্যার কথা:

"আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না –"

কবি রবীন্দ্রনাথ এ গানে কি আমাদের বলতে চাচ্ছেন যে আপনাকে জানার প্রচেষ্টাটা অসীম, সসীম নয়। ব্যাপারটা কি এই, যে নিজেকে আমরা যত বেশী জানতে পারি, ততই আমরা দেখতে পাই নিজের ভেতর অজানা বিশাল জগতটাকে। নিজের ভেতরের অজানা কোন শক্তির সন্ধান পেয়েই কি বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলে উঠেছিলেন:

"আমি সহসা চিনেছি আমারে আজিকে
আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।"

কবি নজরুলের এই বিদ্রোহী কবিতার বানী থেকে ধারনা করা যেতে পারে যে নিজেকে চিনতে পারার, নিজের ভেতরের শক্তিটাকে খুঁজে বের করার মাঝে যেন আছে এক মুক্তির স্বাদ, আছে আনন্দে আত্মহারা হওয়ার মত প্রশান্তি। নিজেকে চিনতে পারাটা হতে পারে সবার জীবনের এক উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য। নিজেকে জানার মাধ্যমে মানুষ পেতে পারে তার সঠিক মূল্য, কাজে লাগাতে পারে তার ভেতরের সুপ্ত শক্তিটাকে, হয়তোবা হতে পারে নিজেই নিজের চালক।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে নিজেকে জানা যায় কি করে? কোন্ টেকনিকে? কোন্ বিশেষ বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন পদ্ধতিতে? দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের নানা শাখায় নিজেকে জানার জন্য নানা চিন্তা ও গবেষণার অবতারণা করা হয়েছে। এ সকল চিন্তা ও গবেষণার ফলাফলগুলো লক্ষ্য করলে নিজেকে জানার ক্ষেত্রে আমরা এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারবো— নিজেকে সম্পূর্ন জানা না হলেও অন্তত: দেখতে পাবো নিজেকে জানার পরিধিটাকে, এবং জানবো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই ব্যাপারগুলো কোনভাবে প্রভাব ফেলছে। প্রভাব ফেলছে হয়তোবা আমাদের অজান্তেই।

চিন্তাবিদ ও গবেষকগন নিজের সম্পর্কের বিষয়গুলোকে নানা নামে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তার মোটা ফিরিস্তি দেখলে অবাক হতে হয়। যেমন ধরুন, আত্ম-ধারনা (self-concept), আত্ম-ভাবমূর্তী (self-image), আত্ম-তত্ত্ব (self-theory), আত্ম-মর্যাদা (self-esteem), আত্ম-নিয়ন্ত্রন (self-control), আত্ম-পরিচালনা (self-regulation), আত্ম-মূল্যায়ন (self-evaluation), আত্ম-সমালোচনা (self-criticism), আত্ম-পুরষ্কার (self-reward), আত্ম-প্রত্যক্ষন (self-perception), আত্ম-ভাবরূপ (self-schematas), আত্ম-চেতনা (self-consciousness), আত্ম-সচেতনতা (self-awareness), আত্ম-পরিচয় (self-identity), আত্ম-বিকাশ (self-actualization)। এর প্রতিটি বিষয় নিয়েই আলোচনা হতে পারে, এবং এক একটি বিষয়ের সাথে অন্য বিষয় বা ক্ষেত্রগুলোর সম্পর্ক ও গতি-প্রকৃতি নির্ধারনের মাধ্যমে মোটা আত্ম-তন্ত্র (self-system) কে বোঝার চেষ্টা হতে পারে। তবে এ নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হবে।

কে এই আমি?

আমি যখন আমাকে প্রত্যক্ষন করছি তখন আমি একদিকে পর্যবেক্ষক (subject), অন্যদিকে আমি হলাম পর্যবেক্ষনের বিষয় (object)। যে আমি দেখছি সে কোন্ আমি? আর আমি যাকে দেখছি সেটাই বা কোন আমি? আমার কি তবে দুটো রূপ আছে — আমি দর্শক এবং আমিই দর্শনযোগ্য বস্তু? উইলিয়াম জেমস ১৮৯০ সালে ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করে দিয়ে বললেন যে আমাদের দুটো রূপ আছে: তাঁর কথামতো "I" এবং "Me"— "I" হচ্ছে subject যে নিজেকে জানার চেষ্টা করছে, আর "Me" হচ্ছে object অর্থাৎ বস্তুগত পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে যাকে জানা হচ্ছে। জেমস তার "Me" টাকে আবার তিনভাগে ভাগ করেন: (১) বস্তুগত আমি — Material Me, (২) সামাজিক আমি — social Me, এবং (৩) আধ্যাত্মিক আমি — spiritual Me। জেমস্ এর ন্যায় মীড (১৯৩৪) এবং কুলী

(১৯০২) আমির এই Me অংশের প্রতি জোর দেন এবং সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কি করে একটি শিশুর মাঝে সামাজিক আমির বিকাশ ঘটে তা বিশদ ব্যাখ্যা করে দেখান। কুলীর মতে ব্যক্তির বিকাশে অন্যদের ভূমিকা হচ্ছে সামাজিক আয়নার ন্যায়। তাঁর মতে যা কিছু আত্ম (self) হিসাবে বিকশিত হয় তা হল যা আমরা ভাবি যে অন্য-আমাদের কি-ভাবছে – হতে পারে তা আমাদের চেহারা সম্পর্কে, আমাদের লক্ষ্য, কাজকর্ম, চরিত্র বা অন্য যে কোন আচরণ সম্পর্কে। কুলীর মতে এভাবে যে আমির বিকাশ ঘটছে তা হল সামাজিক আয়নায় দেখা আমার প্রতিবিম্ব।

আমাকে গড়ছে কে?

অধিকাংশ গবেষণায় ব্যক্তির আত্ম-ধারণা (self-concept) কে বোঝার চেষ্টা হয়েছে ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণযোগ্য বিষয় (object) হিসাবে ("Me") – অর্থাৎ ব্যক্তি তার গুনাগুন, ভাবরূপ, প্রেষণা (motives), এবং অনুভূতি সম্পর্কে যে জ্ঞান পোষণ করে, সেই হিসাবে (Wylie, 1979)। খুবই কম মনোযোগ দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষক বা "I" হিসাবে – যে সচেতনভাবে ব্যক্তিসম্পর্কিত জ্ঞান সৃষ্টি করে। গবেষণার জগতে এমন ঘটনাটি ঘটার পেছনে অনেকেই জেমসকেই দায়ী করতে পারেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে তিনি কসরত করেছেন মূলত: এই প্রশ্নটি নিয়ে যে কে চিন্তা করছে, এবং এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে তিনি যে কোন ধরনের আত্মা (soul), অহম (ego), বা আধ্যাত্মিকতা (spirit) কে বাতিল করে দেন। অবশ্য তিনি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে ব্যক্তি সম্পর্কে জানার ব্যক্তি (knower) বলে কেউ নেই; তার মতে স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তিকে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা করা বড় কঠিন। subject হিসাবে ব্যক্তি ("I") সম্পর্কে জেমস এর শেষ বক্তব্য ছিল : "চিন্তাই হচ্ছে চিন্তাবিদ" ("Thought themselves are the thinker")। একথা উচ্চারণের মাধ্যমে জেমস subject হিসাবে আমি অর্থাৎ "I" এর গুরুত্বটা কমিয়ে দিলেন। সুজান হার্টার (১৯৮৩) এর মতে আমাদের বিকাশমান শিশুর আত্মসম্পর্কিত ধারণাকে পরিপূর্ণ করতে হলে পর্যবেক্ষক হিসাবে আমি ("I") এর পুনরুত্থান ঘটাতে হবে। আমাদেরকে একটি বিতর্কের সম্মুখীন হতে হবে – ব্যক্তি সম্পর্কিত ধারণাটি গড়ে উঠছে কি করে? সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রভাবেই কি ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে নিজের ধারণা গড়ে উঠছে, নাকি ব্যক্তি তার বয়স ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশের সাথে সাথে তার পারিপার্শ্বিক সামাজিক ঘটনাবলীকে নতুন অর্থ প্রদান করে তার সামাজিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া গুলোকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে নিজেই

নিজেকে গড়ে চলেছে? সুজান হার্টার দেখতে পাচ্ছেন যে অধিকাংশ গবেষণা যদিও ব্যক্তির উপর সমাজের প্রভাব নির্ণয়ে ব্যস্ত, তিনি মনে করেন যে ব্যক্তির নিজের উপর নিজের প্রভাবটিকেও গুরুত্ব সহকারে বিচার করতে হবে।

আত্মসচেতনতা ও আত্মপরিচয়

শিশু বয়স থেকেই শুরু হয়ে যায় নিজেকে ব্যক্তি হিসাবে অন্যদের থেকে আলাদা করার প্রক্রিয়া। ছোট্ট শিশুকে এটা বুঝতে হয় যে এই পৃথিবীতে তার একটা অস্তিত্ব আছে – তার একটা ভূমিকা আছে, যা কিনা অন্য ব্যক্তি বা বস্তু থেকে স্বতন্ত্র। এই "অস্তিত্ববাদী আমি" (existential self) এর বিকাশ ঘটার পরই শিশুর পক্ষে সম্ভব নিজের সেই গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য বা ধরনটা নির্ধারণ করা যা কিনা তাকে ব্যক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে। ছোট্ট বয়স থেকে শিশু নিজের সম্পর্কে একটা কিছু ধারণা গঠন করতে শুরু করে, এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এ ধারণার পরিবর্তন ও বিকাশ হ'তে থাকে – এ বিকাশের ধারা শিশুর বুদ্ধি বিকাশের ন্যায়, যা কিনা বস্তু-নির্ভর নির্দিষ্ট ধারণা থেকে বস্তু-বিবর্জিত সাধারণ ধারণার দিকে। গবেষণায় দেখা গেছে যে শিশুদের যদি প্রশ্ন করা হয় "আমি কে?", তখন শিশুরা উত্তর দেয় বিশেষ বস্তুগত শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে যেমন, তাদের বাসার ঠিকানা, শারীরিক গঠন, কিসের মালিক তারা, এবং তাদের খেলার বিষয়। কিন্তু সেই একই প্রশ্ন যদি করা হয় কিশোর-কিশোরীদের কাছে, তখন তাদের উত্তর হ'ল বস্তু-বিবর্জিত সাধারণ ব্যক্তি-বিষয়ক বর্ণনা, যেমন তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তার লক্ষ্য (প্রেরণা) এবং পারস্পরিক সম্পর্কগত বৈশিষ্ট্যসমূহ।

কিশোর বয়সে এসে শিশুর মাঝে ঘটে বিরাট পরিবর্তন – একদিকে ঘটে বুদ্ধিগত শক্তির বিকাশ, আর অন্যদিকে ঘটে সামাজিক প্রত্যাশার পরিবর্তন, বিশেষতঃ সমাজ তখন প্রত্যাশা করে যে কিশোর-কিশোরীরা ধীরে ধীরে কোন বিশেষ সামাজিক দায়িত্বে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে। এমনি অবস্থায় কৈশর হয়ে দাঁড়ায় আত্ম-সচেতনার তুঙ্গে অভ্যুত্থানের কাল। এরিকসনের (১৯৫০, ১৯৫৬, ১৯৬৮) তত্ত্ব অনুযায়ী কিশোর বয়স হচ্ছে আত্ম-পরিচয় গঠনের কাল। এতদিন যা তার কাছে ধ্রুব সত্য ছিল তাও সে যাচাই করে দেখতে চায়। কিশোর বয়সের আমি ("I")'র দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় সমাজের অন্যদের সাহায্য নেওয়া যাতে সে তার নিজেকে ("Me") নতুন করে রূপ দিতে পারে।

নিজেকে নিজের চোখে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা এবং আত্ম-সচেতন হওয়ার ক্ষমতাকে অনেক বিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানী মূল্য দিয়ে থাকেন নিজের সম্পর্কে নিজের আত্মদৃষ্টি বা আত্মসমালোচনামূলক দৃষ্টি অর্জন করার কাজে। মাসলো (১৯৭১) এর মতে আত্মপরিচয়ের সর্বোচ্চ শিখর হচ্ছে আত্মাকে অতিক্রম করে যাওয়া (transcending the self), এবং এটা করার মাধ্যমে অহম্‌-মুক্ত মানুষে রূপান্তরিত হওয়া। এই অহম্‌-মুক্ত অবস্থা হচ্ছে আত্ম-সচেতনতা ও আত্ম-দর্শনের (self-observation) পরিপূর্ণ বিলুপ্তি। মাসলোর এই অহম্‌-মুক্ত অবস্থায় পৌঁছার ধারণাটি প্রাচ্যের ঐ সমস্ত দার্শনিকদের ধারণার প্রায় যারা ইগো বা আত্মাকে পরিপূর্ণ বিনাশ সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিব্বতের এক বৌদ্ধ গুরু ট্রাংপা'র মতে মানুষ এর উচিত দু'ধাপ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অহম্‌-মুক্ত অবস্থায় পৌঁছা। প্রথম ধাপের লক্ষ্য হ'ল এটুকু অনুধাবনের চেষ্টা করা অহম্‌ অনড় অটল চির-স্থায়ী কোন বস্তু নয়, এটা হচ্ছে এক ক্ষণস্থায়ী চলমান সত্ত্বা, এবং আমাদের আমাদের বদ্ধমূল ধারণা-ই ইগোকে শক্তরূপ দান করে। প্রথম ধাপ অতিক্রম করার পরও আমি বা ইগোর একটা অংশের- এই নূতন অর্জিত আমি-হীনতা বা অহম্‌-বিলুপ্ত অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করার সমস্যা থেকে যায়। দ্বিতীয় ধাপের দায়িত্ব তাই এই অহম্‌-বিলুপ্ত অবস্থার পর্যবেক্ষক যে আমি তার বিলুপ্তি। তাই সত্যিকার অহম্‌-মুক্তি হচ্ছে অহম্‌-মুক্তি ধারণার অবসান ("True egolessness is the absence of the concept of the egolessness")। প্রাচ্যের ধারা অনুযায়ী বিচার করলে উন্নত আত্মপরিচয় হ'ল 'পর্যবেক্ষক' ও 'পর্যবেক্ষণ-বিষয়' হিসাবের দুই আমি'র মধ্যে দার্শনিক সমন্বয় সাধন বা মিলন ঘটানো (সুসান হার্টার, ১৯৮৩)।

আত্ম-মর্যাদা

মানুষ শুধু নিজেকে বর্ণনা করে নিজের সম্পর্কে নিরপেক্ষ ধারণায় পৌঁছে তা নয়, মানুষ নিজেকে মূল্যায়নও করে (value judgement)। এই মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষ তার নিজের সম্পর্কে আত্ম-মর্যাদা তৈরী করে। আত্ম-মর্যাদা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। খুব কম গবেষকই এই আত্ম-মর্যাদাকে নির্দিষ্ট ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। একমাত্র উইলিয়াম জেমসই আত্মমর্যাদাকে সংজ্ঞায়িত করেন এইভাবে:

$$\text{আত্ম-মর্যাদা} = \frac{\text{সাফল্য}}{\text{সাফল্যের ভান}}$$

অন্যকথায় বলা যেতে পারে যে একজন ব্যক্তির আত্ম-মর্যাদাবোধ হচ্ছে তার সাফল্য ও সাফল্যের সম্ভাবনা বা potentiality 'র অনুপাত। সুজান হার্টার (১৯৮৬) 'সাফল্যের ভান' (Pretention) এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে Potentiality ব্যবহার করেন। একজন ব্যক্তির আত্মমর্যাদাবোধ পজিটিভ হবে যদি তার সাফল্যের পরিমাণ তার সাফল্যের সম্ভাবনা বা সাফল্যের ভান এর চেয়ে বেশী হয়। এর উল্টোটা ঘটলে আত্মমর্যাদাবোধের অবনতি ঘটবে। কুলী (১৯০২) এর মতে যে ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে উচ্চ আত্মমর্যাদাবোধ, তার পক্ষে দুষ্ট লোকের মিথ্যা প্রশংসায় গলে যাওয়া বা মিথ্যা অপবাদে আহত হওয়া, এর কোনটাই সম্ভব নয়।

আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষই হচ্ছে মানসিকভাবে সুস্থ মানুষ। নিম্ন মানের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষেরা কিছু মানসিক সমস্যায় ভোগে, যেমন অসুস্থ আবেগের বিকাশ, দুর্বলচিত্ত, মনদৈহিক রোগ, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি। নিম্ন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি অন্যদের থেকে পাওয়া ভালবাসা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। এর কারণ হতে পারে যে তারা অন্যের দ্বারা খারাপ কিছু ঘটবে এটাই আশা করে, ফলে অন্যের থেকে পাওয়া সত্যিকার ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহারকে ও স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়। নিম্ন আত্ম-মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ তার নিজের সম্পর্কে ব্যর্থতার ধারণাটি তার জীবনের সকল ক্ষেত্র সম্পর্কে সাধারণীকরণ করে বসে, যেমন তাদের ভেতর ধারণা জন্মায় যে তাদের পক্ষে সামাজিক কর্মকাণ্ডে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়, তারা না পারবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা বিয়েতে সাফল্য লাভ করতে, না পারবে তাদের লেখাপড়া বা পেশাগত জগতে উন্নতি লাভ করতে। গবেষণায় এটা প্রমাণ পরিষ্কার যে নিজের সম্পর্কে সুস্থ-ধারণা ও আত্ম-মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিই তার জীবনের সকল সম্পর্কে ও ক্ষেত্রে সুস্থভাবে খাপ খাওয়াতে ও উন্নতি অর্জন করতে পারে (ম্যাককান্ডলেছ, ১৯৭০)।

মানুষের নিজের সম্পর্কে নিজের এই মূল্যায়ন - আত্ম-মর্যাদাবোধ যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে মনে দরকার, এটা কি করে গড়ে উঠে, এটা বৃদ্ধির কোন উপায় আছে কি? ম্যাককবী (১৯৮০) বর্ণনা করেছেন যে উন্নত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বালকদের বাবা-মারা তাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছেন। এককথায় এই বাবা-মারা হ'চ্ছে খুবই গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন, তারা তাদের শিশুকে মন থেকে গ্রহণ করেছে, আদর দিয়ে বড় করেছে, শিশুর প্রতিটি আনন্দ কিংবা সমস্যায় পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা শিশুদের প্রশ্রয় দেয়নি, শিশুদের কথায় চালিত হয়নি বরং প্রয়োজনে শিশুদেরকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা

আচরণের মাধ্যমে পরিচালনা করেছে। বালিকাদের আত্মমর্যাদার উপর গবেষণা করতে গিয়ে হেইলস (১৯৭৯) খুঁজে পান যে সেই সমস্ত বালিকাদের আত্মমর্যাদাবোধ উঁচু যাদের বাবা-মা তাদের উচ্চ আদর ও সহানুভূতি দেখিয়েছে তাদের প্রতি, উৎসাহ যুগিয়েছে তাদের নিজের মত চলতে, যা বলার তা পরিষ্কার ভাবে বলেছে, এবং মেয়েকে বাড়ীর কিছু কিছু দায়িত্ব নিতে শিখিয়েছে। বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলগুলোকে বিশ্লেষণ করলে এটাই দাঁড়ায় যে নিঃস্বার্থ বা শর্তবিহীন ভালোবাসা ও পজিটিভ অনুভূতি পাওয়াই হ'ল উচ্চ আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টির উপায় (ফেলসন, ১৯৮১)।

ভবিষ্যতের আমি

মানুষ শুধু তার অতীত দ্বারাই চালিত হচ্ছে না, মানুষের ভবিষ্যত চিন্তা বা "ভবিষ্যতের আমি" র চিত্রও মানুষকে তার বর্তমান কাজ-কর্মের উন্নতি বা অবনতিতে সাহায্য করছে। ভবিষ্যতের আমি (possible self) নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে যে যাদের মাঝে ভবিষ্যতের নিজ সম্পর্কে উচ্চ পজিটিভ ধারণা রয়েছে তারা জীবনের অনেক কঠিন দুর্যোগ সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে। পোর্টার, মার্কাস ও নুরিয়াস (১৯৮৪) গবেষণা করেন এমন ব্যক্তিদের নিয়ে যারা জীবনে দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে গত কিছুদিনের ভেতর। দুর্যোগের ধরন ছিল, বন্ধুদের সম্পর্ক হারানো, আপন জনের মৃত্যু কিংবা এ জাতীয় কিছু। এই গবেষণায় ছিল ৩০ জন দুর্যোগে ভোগা মানুষ ও ৩০ জন দুর্যোগ-মুক্ত মানুষ। দুর্যোগ ভোগা মানুষদের গবেষকগণ আবার দু'ভাগে ভাগ করেন, একভাগে ছিল তারা, যারা মনে করে যে তারা দুর্যোগ কাটিয়ে উঠেছে, অন্য ভাগে ছিল তারা যারা এখনো দুর্যোগের চাপে ভুগছে। দুর্যোগে পড়া এই দু'গ্রুপের তুলনা করে দেখা গেল যে যদিও তাদের বর্তমান সমস্যার মাত্রা একই ধরনের, তবুও তারা তাদের ভবিষ্যতের নিজকে মূল্যায়ন করার দিক থেকে ভিন্নতর। দুর্যোগ অতিক্রান্ত মানুষদের ভবিষ্যত সম্পর্কিত নিজকে নিয়ে ধারণাটি খুবই পজিটিভ, দুর্যোগ অতিক্রম করতে না পারা মানুষদের চেয়ে।

পরীক্ষায় ভালো করছে কারা ?

পেরী এবং ম্যাগনাছন (১৯৯১) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর গবেষণা করে দেখতে পেয়েছেন যে যাদের নিজেদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা রয়েছে তারা একটি অসাফল্যজনক পরিস্থিতির জন্য কখনো নিজের সামর্থ্যের অভাবকে দায়ী করেন না,

বরং তারা মনে করে যে অসাফল্যের কারণ যে তারা সঠিক স্ট্র্যাটেজী গ্রহণ করেনি বা আরো অতিরিক্ত চেষ্টা করেনি। কিন্তু অপরপক্ষে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিজের সম্পর্কে তেমন উঁচু ধারণা নেই তারা একটি অসাফল্যজনক পরিস্থিতির জন্য নিজের অক্ষমতাকে দায়ী করে। এই যদি অবস্থা হয়, এই গবেষকগণ মনে করেন যে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদেরকে শুধু কোন নির্দিষ্ট বিষয়-পড়ালেই চলবেনা, ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ সম্পর্কে নিজের ধারণাটা যেন দিন দিন উঁচু হতে পারে সেদিকেও শিক্ষককে অনুপ্রেরণা দিতে হবে। শিক্ষক কিংবা বাবা-মা কে একথা বলা বন্ধ করতে হবে যে – "তুমি একটা গাধা, তোমার দ্বারা কিছু হবেনা"। কে জানে কতজনে এ গুরুজনের মূল্যায়ন মেনে নিয়ে সারাজীবন নিজের অজান্তে যে অসাফল্য অর্জনের জন্য তৈরী হয়ে থাকে, এবং অসাফল্য অর্জনের উপযোগী কাজগুলো ও মনোভাব পোষণ করতে থাকে।

উপসংহার

মানুষ হচ্ছে তার আশার সমান বড়। মানুষ তার কাজ ও চিন্তার দ্বারা হ'তে পারে নিজেই নিজের ভাগ্য নির্মাতা। এ জন্য প্রয়োজন মানুষের আত্মঅনুসন্ধানের ভেতর দিয়ে আত্মশক্তির জাগরণ। মানুষের আত্ম-ধারণা, আত্মমর্যাদা ও আত্মবিকাশের ধারা নিয়ে দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে যে তথ্য ও জ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে তার আলোকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, আমাদের শিশু লালন-পালন পদ্ধতি, ও আমাদের নিজে-দের সম্পর্কে নিজেদের ধারণাটা বদলানো দরকার। নিজের সম্পর্কে নিজের এই নতুন ধারণাটা খুঁজে পাওয়ার পর ঘটবে আমাদের পুনঃজন্ম, এ জনমেই। নিজেকে জানার সার্থকতা হবে সেখানেই যখন আমরা আমাদের নিজেদের জন্য ছেড়ে দেবো মর্যাদার আসন। আর নিজেদেরকে মর্যাদা দিতে শিখেই হয়তো আমরা পারবো অন্যদেরও মর্যাদা দিতে।

** এই নিবন্ধে উল্লেখিত গবেষণাসমূহের বিস্তারিত তথ্য লেখকের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ভিত্তিতে পাওয়া যাবে।
— সম্পাদক **

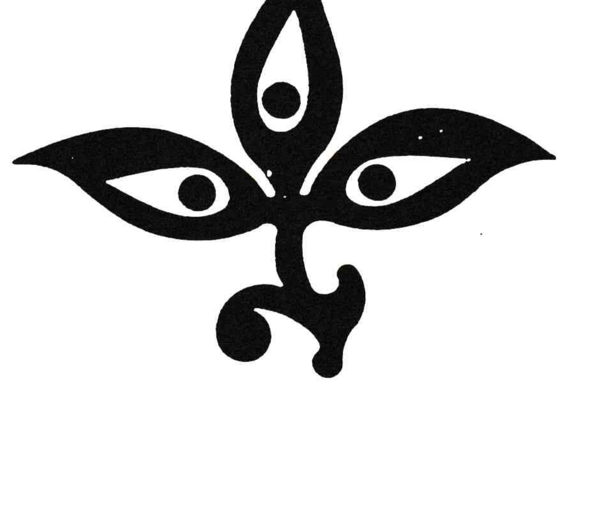

একমাত্র পাবেন কলকাতাতে — কলকথা

পল্লব গঙ্গোপাধ্যায়

কিছুদিন আগে কলকাতাতে সপরিবারে গিয়ে বাজারহাট করেছি। ওখানে শপিং করার আগে কিছু Advertisement চোখে পড়েছে — তা আপনাদের লিখে জানালাম। এরকমের কলকথা — বোধহয় একমাত্র কলকাতাতেই পাবেন।

— জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরনধারিনী .... শারদ শুভকামনায় সবার সাথী, বঙ্গজীবনের অঙ্গ —— বোরোলীন।

— আগামী রবিবার কি আপনার প্রেমিকার জন্মদিন? নাকি প্রিয় বান্ধবীর বিবাহ বার্ষিকী? ভাইঝির বিয়ে? নাকি বোনপোর পৈতে? নিশ্চয়ই এইসব আনন্দ মুখর উৎসব অনুষ্ঠানে আপনাকে দিতে আপনাকে দিতে হবে শুভেচ্ছাসহ একটি বা দুটি উপহার — আসুন লক্ষী স্টোরস্-এ।

— বহুদিনের স্বপ্ন সফল হল আজ — আলাদিন থেকে এলিফ্যান্ট। দোকান লাইমলাইট।

— আপনার ছেলে নাকি নাক সিঁটকায়! আপনার শাশুড়ী মুখ ভেটকান! আপনার শ্বশুর সরিয়ে রাখেন! আপনাকে সাহায্য করা দরকার — বাজাজ এরোমেটিক গ্যাস কুকিং রেঞ্জ।

— সত্যের দ্বারা অশুভ শক্তির পরাজয়ের আনন্দকে বরন করার সময় এসেছে। সময়কে উপহার দিন। নির্ভুল সময়। অলউইন কোয়ারজ।

— এখন ভারতে এই প্রথম ...... তুল ভেরসা। প্রুডেন্ট মাউথওয়াশ।

— আগুন, বন্যা, চুরি ও দাঙ্গার যতদিন না পৃথিবীর মুক্তি .... ততদিন আপনার চাই ঘরের জিনিসপত্রের জন্য এন আই সির নিরাপত্তার সীল। ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স কোম্পানী।

-জবর শাড়ীর নতুন খবর। এবার পুজোর বিশেষ আকর্ষণ "কাঞ্জিভরম কোটা"। দোকান "আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয় (শীততাপ নিয়ন্ত্রিত)"।

-পুজো মানেই আনন্দ আর "আনন্দ"। "আনন্দ" এর পোশাক।

এছাড়া আপনাদের জানিয়ে রাখি তুলতুলে আইসক্রীম "softy" (Rawdon street and Theatre Road Crossing)- অবশ্যই Taste করবেন পরের কলকাতাতে।

শিশুর উপরে আপনার কর্তৃত্বের প্রভাব কতটুকু, জানেন?

কামরুন নেসার

বাংলাদেশের প্রত্যেক সামাজিক শ্রেণীতে মা-বাবারা তাঁদের ছেলেমেয়েদের প্রতি কর্তৃত্বমূলক ব্যবহার করেন এবং ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এভাবে শৈশবেই মা-বাবার কর্তৃত্বের কারণে শিশুরা উদ্যোগ হারিয়ে ফেলে। ছাত্রদের পরীক্ষায় নকল করা, "বস" অফিস থেকে চলে যাবার সাথে সাথে কর্মীদের কাজ থামিয়ে দেয়া - এ সবই এই উদ্যোগহীনতার ফল। কাজেই মা-বাবার কর্তৃত্বের তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন আছে।

মা-বাবার কর্তৃত্ব শিশুর সাফল্য অর্জন প্রেষণাকে (motivation) বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। তাঁদের প্রাধান্য বা কর্তৃত্বের তাৎপর্য বর্তমান সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে - এ ব্যাপারে খুব বেশী দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে না। মা-বাবার কর্তৃত্ব শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের সাথে সম্পর্কিত এবং সেকারণে এই সমস্যার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেয়া গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যক্তি নিজেই তার 'উঁচু মানের কাজ করার ক্ষমতা' কে নির্ধারণ করে এবং সে সর্বতোভাবে তার লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে। তবে একজন ব্যক্তি সাফল্য অর্জনের জন্য কতখানি সচেষ্ট হবে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হল ব্যক্তির সাফল্য অর্জন প্রেষণার আকাঙ্ক্ষা।

'প্রেষণা' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রেষণা বলতে বুঝায় প্রাণীর এমন একটা অবস্থা যা তাকে কোন আচরণ বা কাজে উদ্বুদ্ধ বা চালিত করে। প্রেষণা মানুষের কাজের শক্তি যোগায়। মনোবিজ্ঞানীরা প্রেষণাকে প্রাণীর আচরণ-এর শক্তি সঞ্চারকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রেষিত আচরণ একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বঞ্চনা বা অভাববোধ থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। অভাব মিটানোর তাড়না ব্যক্তিকে আচরণ বা কাজে প্রবৃত্ত করে এবং লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে অভাববোধ দূর হয় ও তাড়নার উপশম ঘটে।

'সাফল্য অর্জন' প্রেষণা বা 'কৃতি-প্রেষণা' একটি বিশেষ ধরনের প্রেষণা। সাফল্য অর্জন প্রেষণা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা এবং সংজ্ঞা রয়েছে। যেমন, কেউ মনে করেন সাফল্য অর্জন প্রেষণা হচ্ছে এক

ধরনের "আত্মপূর্ণতা" বা "আত্ম প্রসারণ"। আবার অনেকে মনে করেন এটা হচ্ছে "আত্ম-সামঞ্জস্যতা" বা "যোগ্যতা" অথবা "আত্ম সংহতি"।

মা-বাবার কর্তৃত্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক পৃথিবীতে শিশুদের অভিযোজনের ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কর্তৃত্বকারী মা-বাবা শিশুদের খুব বেশী নিয়ন্ত্রনে রাখে এবং খুব প্রভুত্বব্যঞ্জক হয়। তারা শিশুকে প্রায়ই শাস্তি দেয়, হুমকি দেয় এবং শিশুর বয়স ও আদর্শ চিন্তার উপযোগী হওয়া থেকে শিশুকে বিরত রাখে। তারা সবসময় শিশুর সমালোচনা করে এবং ভয় দেখায়। কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুর চাহিদার ব্যাপারে বৃহৎ পরিকল্পনাও করে।

মা-বাবার কর্তৃত্বের অনেক কারণ রয়েছে। কিন্তু কারণ যাই হোক — ফলাফল একই। মা-বাবার কর্তৃত্ব যখন রুক্ষ অথবা অনিয়মিত হয় তখন শিশুর উপর এর কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এটা বিশেষভাবে সত্যি হয় যখন মা-বাবা খুব বেশী রক্ষনশীল অথবা প্রত্যাশিত (demanding) হয়।

অনেকের মতে পিতা-মাতাদের একজন অথবা দুজনই যদি কর্তৃত্বকারী হয় তবে শিশু অযথার্থ বোধ করে, হীনমন্য ও বিভ্রান্ত হয়। এসব শিশুরা যখন বড় হয় তখন তারা মনে করে অন্যরা তাদেরকে প্রতারিত করছে এবং নিজেদের মধ্যে একটা "কমপ্লেক্স" গড়ে উঠে। তাছাড়া অতি কর্তৃত্ব বা দুর্ব্যবহার কারনে শিশুরা তাদের মা-বাবার উপর খুব বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। জীবনের প্রথম বছরে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে শিশু যেন কোন অবস্থাতেই মানসিকভাবে অন্যের উপরে নির্ভরশীল না হয়। অতি কর্তৃত্বের কারনে শিশুর অনেক সামাজিক অসুবিধা হতে পারে, সে সাধারনতঃ জনপ্রিয় হয় না এবং প্রয়োজনবোধে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হয়। সে যখন স্কুলে অথবা অন্যদের সাথে থাকে তখন বাসার প্রতি আকর্ষন বোধ করে।

এই ধরনের শিশুদের মধ্যে প্রত্যাহারমূলক প্রতিক্রিয়া, মানসিক নিয়ন্ত্রনের অভাব, সত্যিকারভাবে দায়িত্ব গ্রহনে অনীহা দেখা যায়। এরা বয়ঃপ্রাপ্ত হতে ভয় পায়, নিজের মতামতের প্রতি কোন আত্মবিশ্বাস থাকে না। এরা খুব সহজেই নির্দিষ্ট কোন দলের দ্বারা প্রভাবিত হয় ও সেই দলের প্রতি নির্ভরশীল হয়। এই ধরনের শিশুরা স্কুলেও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। এরা পড়ায় ভালও হতে পারে কিন্তু অংকের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। এরা শিক্ষকের কাছে অতিরিক্ত

মনোযোগ প্রত্যাশা করে এবং তার কাজ গুণগত দিক থেকে যত্নহীন হয় এবং তাদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায়। যখন সে স্কুলে খারাপ করে, মা-বাবা তখন তার প্রতি আরো মনোযোগী হন এতে করে শিশুটি আরও খারাপ করে। সে সামাজিকভাবে অপরিপক্ক, দায়িত্বহীন এবং স্বার্থপর হয়।

শিশুর উপরে মা-বাবার অতি কর্তৃত্ব তার ব্যক্তিত্ব বিকাশকে ক্ষতিকর ভাবে প্রভাবিত করে। এই ধরনের শিশুরা দায়িত্ব গ্রহন করতে ভয় পায় এবং নতুন কোন কিছু করার উদ্যোগ তার মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে কম হয়। আর এর ফলে শুধু শিশুটিই একক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না, বরং সাথে সাথে জাতি সামগ্রিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। শিশুর সুষ্ঠু-পূর্ণ বিকাশ-মূলক প্রক্রিয়ার উপর মা-বাবার সামান্য কর্তৃত্ব থাকা উচিত। মা-বাবা যদি তাদের পরিমিত নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হন তবে তাঁদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাফল্য অর্জন প্রেষণাটি উচ্চ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

বহু গবেষণায় দেখা গেছে যে মা-বাবার কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য শিশুর সাফল্য অর্জন প্রেষণাকে প্রভাবিত করে। মা এর কর্তৃত্বের সাথে শিশুর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও সাফল্য অর্জন প্রেষণার সম্পর্ক বেশী দেখা গেছে। এর কারন হিসাবে বলা যেতে পারে যে শিশুরা বাবার চেয়ে মা কেই বেশীর ভাগ সময় কাছে পেয়ে থাকে। শিশু লালন-পালন পদ্ধতিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে 'মা'। শৈশব থেকেই শিশুরা যেহেতু মা-এর সংস্পর্শে বেশীর ভাগ সময় কাটায় এ কারনে মায়ের ব্যবহার ও মনোভাব তাদেরকে বেশী প্রভাবিত করবে বলে মনে করা যেতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশে খুব কম মা-ই বাইরে চাকুরী করেন [যদিও বর্তমান দেখা যাচ্ছে আগের তুলনায় এখন অনেক মা-ই চাকুরী ক্ষেত্রে আর পিছিয়ে নেই] এ কারনে শিশুরা মা-কে অধিকাংশ সময় কাছে পায় এবং বাবাকে তুলনামূলকভাবে কম সময়ই পায়।

আপনি কি জানেন যে উচ্চ সাফল্য অর্জন প্রেষণা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আচরন নিম্ন-সাফল্য অর্জন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের থেকে লক্ষনীয়ভাবে পৃথক? উচ্চ কৃতি প্রেষণা বিশিষ্ট ব্যক্তির আচরনে যে সমস্ত লক্ষনসমূহ পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ:

উচ্চ কৃতি প্রেষণা বিশিষ্ট ব্যক্তি –

(১) জীবন ও চিন্তার জগতে এমন সব ঘটনা বা বস্তু বেছে নেয় যাতে সফলতা, নৈপুণ্য ও উৎকর্ষতার পরিচয় রয়েছে।

(২) তুলনামূলকভাবে অনুসন্ধানপ্রিয় ও পদমর্যাদা অন্বেষণকারী।

(৩) উৎকর্ষ লাভের জন্য অবিরাম চেষ্টা করে এবং কার্য্যসম্পাদনে উচ্চমানের পরিচয় দেওয়ার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে।

(৪) কখনো অন্যের ভয়ে অথবা অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে না।

(৫) অভিযানপ্রিয় হয় এবং যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকে।

(৬) সাধারণতঃ যে সব কাজে অগ্রসর হয় সে কাজে তার সফলতা লাভের সম্ভাবনা অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।

(৭) সফলতা পেলে নিম্ন কৃতি প্রেষণা বিশিষ্ট বাচ্চাদের তুলনায় বেশী আনন্দিত হয়।

(৮) সাধনামূলক কাজে কঠোর পরিশ্রম করে, দ্রুত শেখে এবং বাহ্যিক কোন বিশেষ চাপ ছাড়াই পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য নিজের সমস্ত চেষ্টাকে কাজে লাগায়।

(৯) অনুভব করে যে প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও তাদের সফলতা লাভের সম্ভাবনা বেশী।

(১০) সব কাজ সময়ানুযায়ী করে এবং সময় সম্পর্কে সবসময় সচেতন থাকে।

(১১) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা দায়িত্ববোধ চিন্তাশীল কাজে দক্ষতা এবং মানসিক দুঃশ্চিন্তামুক্ততা।

(১২) দায়িত্ববোধ ও অন্যের কল্যাণের ইচ্ছায় সমন্বয় দেখা যায়।

যে পরিবারে শিশুকে স্বাবলম্বী হতে শেখানো হয়, চিন্তা ও কর্মে স্বাধীনতা দেওয়া হয় তারা কার্য্য সম্পাদনে উচ্চ হয়।

উপরোক্ত তথ্যসমূহই পাঠকের কাছে তুলে ধরবার একটাই উদ্দেশ্য এবং তা হল মা-বাবা যদি তাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চ কৃতি প্রেষণা বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে গড়তে চান তবে নিজেদের কর্তৃত্বমূলক ব্যবহারের ব্যাপারে তাদের সচেতন হবার প্রয়োজন আছে।

রক্ত-লেখা

আনসারী খান

যদি রক্ত দিয়ে কেউ লিখতে পারে
তবে সেই লিখুক জীবনের কবিতা।
অন্য কারো লেখা পড়বার ধৈর্য আমার নেই—
সন্ন্যাস ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীতে ফিরে
বিস্ময়-দৃষ্টি আর গভীর মনীষায়
চমকে লাগিয়ে—জরথুস্ত্র বলেছেন।

হয়ত তাই-ই ঠিক — রক্ত বিনা লেখা যায়?
অনাদি কাল ধরে আমিও লিখতে চাই।
শান্ত নদীর বাঁকে — নিঝুম জলা কুটিরে —
প্রাচুর্যের সন্ন্যাস ছেড়ে — সভ্যতার পৃথিবী ঘিরে
আমার জরথুস্ত্রেরা থাকে অমলিন।
তাঁদের জন্য লিখব বলে ভেবেছি অনেকদিন।
শুধু ভেবেই গিয়েছি — হয়নি কলম ধরা —
আমার ধমনী রয়েছে থেমে — উষ্ণ আবেদনে ভরা।
যাদের জন্য লিখেছি আমি
রাত-দিন-দুপুরের দ্বারে থামি থামি —
পড়েনি তারা ধৈর্যের অভাবে।
অহম এবং প্রয়োজনের সন্ন্যাস নিয়েছে — ভেবে —
আমাদের মহাপুরুষের মতো হবে।
অপচয়ের এ ঘোর ভেঙেছে সেই কবে!
তাই, ভাবছি, আবার আমার জন্যই লিখব —
অহম এবং বিশ্বাসের সন্ন্যাস-নৌকোয় ভাসব।

কিন্তু, রক্ত কোথায় পাই?
শিরা-উপশিরা-ধমনী হাতড়ে যাই —
বুকের মাঝেও হাত দিয়ে দেখি —
কোথাও রক্ত নেই — শুধু নীল রঙ মাখি —
সোনালী প্রাচীর খেলা করে অমূল্য অট্টালিকা ভরি।
পৃথিবীর খোঁয়াড় ভরা অসংখ্য শুয়োর-শুয়োরী,
শেয়াল-শকুন — শেষ না-করা মহাব্যক্তি-রূপে
পান করেছে আমার রক্ত নির্বাক-নিঃশুপে।
শ্যামলী বাঙলায় — আমার বন্ধুর সাজে
রেখে এসেছি অনেকখানি — মৌন কবর মাঝে।
নিঃশব্দ নিঃস্বনে অনেক হয়েছে নষ্ট — অলখে —
শ্রেষ্ঠ মানুষের ভেজাল কীর্তিকলাপ দেখে।

বটের স্তূপের মত নিঃশ্চুপ আমি
শব্দহীনতায় গোপনে এসে থামি-
মগজ ভান্ডারে- স্নায়ুও খেয়ে নিল তারা-
আমায় আপন বলে ভান করে যারা।
খেয়ে নিল সশব্দ ভঙ্গীতে - দুর্দান্ত নিশাচরের মত।
তোমার হৃদয় যখন লুব্ধ রসনায় হয়ে রত
চেটেপুটে খেয়ে নিল আমার হৃদয় -
রক্তশূন্যতায় আমি সর্বস্বান্ত হই।
আমার লাশের গন্ধে মাতাল হয়ে -
ছুটে এলো অসংখ্য মানুষ - কিলবিলিয়ে -
ছুটে এলো মাংসের উৎসবে -
যেন স্বর্গরাজ্য মহাভোজ হবে।
তুমিও তাদের সাথে এলে-
প্রয়োজনের চাদর পরে নিলে -
হৃদয়-কলিজা-কড়া প্লেট নিয়ে হাতে -
আমার কলজেটা খাব বলে- মাংসোৎসবের রাতে।

তাই, দেশহীন-স্বজনহীন-রক্তশূন্য মূর্তি
জেগে থাকে লোমহর্ষে নিয়ে মৃত্যুমূর্তি।
আমার দেহের মত লোভনীয় শ্মশান ঘাট ছাড়ি -
পালিয়ে গেল আমার ভূতও - তোমাদেরই বাড়ী।
বোধির সুহৃদ-বিমোক্ষোর্মিন অবিরত মাছি
কেন আমি নির্ভয়ে এত একা মাছি?
পৃথিবীতে বাস করে লক্ষ-কোটি শুয়োর-শুয়োরী -
কারো ভাল লাগিল না মনের ময়ূরী।
আমি তবে শ্রেষ্ঠ শুয়োর?
আমি তবে নিকৃষ্ট শুয়োর?
হয়তবা ঈশ্বরের কাছাকাছি মহৎ শুয়োর আমি -
পলায়নপর সরীসৃপ- ভূমি গর্তে নামি।
আমি নরকের কীট - আমি কোমল কবুতর -
জলশূন্য করুন-ভেঁড়ু - প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ কুমির?

এমনও তো হতে পারে - শুধু আমিই মানুষ!
চারিদিকে জীবিতেরা বোধশূন্য রঙীন ফানুস!
যে আমায় মানুষ ভাবে - জানবেন তার ঠাঁই নাই-
অন্যান্য ফানুসেরা, আমার রক্তের হিসাব আর তৈরী কর তাই।
কার্য হলে - তোমাদের রঙীন পাছায় কষে দেব সশব্দ লাথি -
শব্দহীন হৃদপ্রহরে বুকের গভীরে দেব বেগুনী গাঁথি।

আমি এক চরিত্রযুক্ত হাঁড়ী শুয়োর - ঘোঁত্ ঘোঁত্ করি -
যেন নষ্ট চনার মতোই প্রকাশ্য করে মরি।
ছিঁড়ে খাব কলজে তোদের যদি রক্ত বৃথা যায় -
গুঁড়িয়ে দেব মাথার খুলি - অন্যথা নাই।
ভালমানুষীকে ভেবে নিয়েছিস আমার দুর্বলতা -
নরকের কীট তোরাই - মোর জ্বলন্ত শিখায় নাচে তোদের মৃত্যু-কথা।
জন্ম মূর্খ নই আমি - আমি হিটলারের ভাই -
পাছায় লাথি মেরে আমি সব মানুষের মৃত্যু ঘটাই।
হীনমন্যতার এই আনন্দ-সুখে ওঠে গর্বে ভরি
আমার বুকের পাঁজর - শুয়োরের শুয়োরত্ব স্মরি।
নিজের জন্যে লিখতে হবেই - তাই, রক্ত আমার চাই -
তোদের বুকের রক্ত হলেও কোন আক্ষেপ নাই।

আপন আত্মা মিলিয়ে দিলেম পরকে ভালবেসে
নবীন স্বপ্নে উড়ব ভেবে রঙীন মেঘের দেশে।
মেঘ ভেসে গেল উদাসী অতীত নির্ঝরিণীর তানে
ভ্রমর একাকী গুঞ্জন রাখি বিষ ঢেলে দিল প্রাণে।
নির্লিপ্ত ভালবেসেছিল মোর আমারই দেশ-মাতা
কখন গোপনে দিয়েছিল মনে আমার এ মানবতা।
চোখ মেলে দেখি আমারই সম্মুখে শাসিল বসন কাড়ি -
ধর্ষিত হয় দেশমাতা মোর ধুলায় যায় গড়াগড়ি।
তাও রেখে গেছি সুখের আসনে বক্ষ করেই টানি -
নীলকণ্ঠ বেশে সকল দুঃখ নিজের ভিতরে আনি।
তুমিও যখন ভীরু মিশে বসিয়ে গভীর উন্মাদনায় -
ফুলমালা বলে লাথি দিলে কণ্ঠে আমার হৃদয়-বিদায় -
তোমারই সম্মুখে সকলে করেছে কবিতার - শ্লীলতাহানি -
আমি নিঙাড়ি প্রানপণে দিল সত্য-সীমানা টানি।
ধর্ষিত হতে কোন দুঃখ নেই - তোমরা জান কি-তা?
আমার দেশ ও প্রেমের মতই মান তা আমার কবিতা।
তাই বসে বসে রক্ত মানসে লাথি চালিয়ে যাই -
কষ্ট ছন্দে গভীর আনন্দে সকল রঙীন পাখায়।
ভুল বুঝোনা মোর - ধরোনাকো এই উদাসী-করুন হাত
আমার রক্ত লাথি হতে ঝরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ।
আমার দেশের এ দান চাই -
আমি প্রেমের মন নাচাই -
আমি কবিতায় রঙ সাজাই -
আমি আপনার লাশ তাই -
অবিরাম লিখে যেতে চাই -
আমার আপন রক্ত চাই।

সংবিধান হয়ে যাও তোমরা সকলে-
রক্ত-লেখা আমি লিখব বলে -
বেরিয়েছি আবার আর পুরাতন রক্তের খোঁজে -
বেরিয়েছি তাই আর আমার হৃদয় মাঝে।

মুক্তি

আনসারী খান

থামতে থামতে চলেই গেলাম শেষ সার্কিটের ধারে — ।

ভালবাসার জঙ্গল থেকে যে ফুল পেলাম ভেবে
বাড়িয়ে দিলেম হাত —
চমকে দেখি তার পাপড়ি ধুলোয় আমার বুকের খুন -
ধমনীর শেষপ্রান্তে উইপোকা নাচে —
বোধের মাতাল নেশা ভেঙে ফেলে সোনালী আলোয়।
আচ্ছা, উদ্বাস্তু শিবিরে তুমি ঘর গড়তে পার?
তবুও স্মৃতির পাখিরা কেন মুক্তি-বৃত্তে ঘোরে!
তোমাদের মুক্ত-আঙিনায় আমি এক ওরাং ওটাং
হলদে দাঁতে গোলাপ গুচ্ছ খেয়েছি —
তবুও শিকল পরাতে কেন ঘোর আপত্তি জানাই।
আজ থামতে থামতে চলেই গেলাম শেষ সার্কিটের ধারে।
শ্রদ্ধান্তে বাড়িয়ে দিলাম নরোম দু'হাত —
পরিয়ে দাও — বোধের রক্ত গড়া মুক্তির বাঁধন —
তোমরা সকলে — শেষ সার্কিটের ধারে।

থামতে থামতে মেনেই নিলাম - গতি শুদ্ধ নয়।

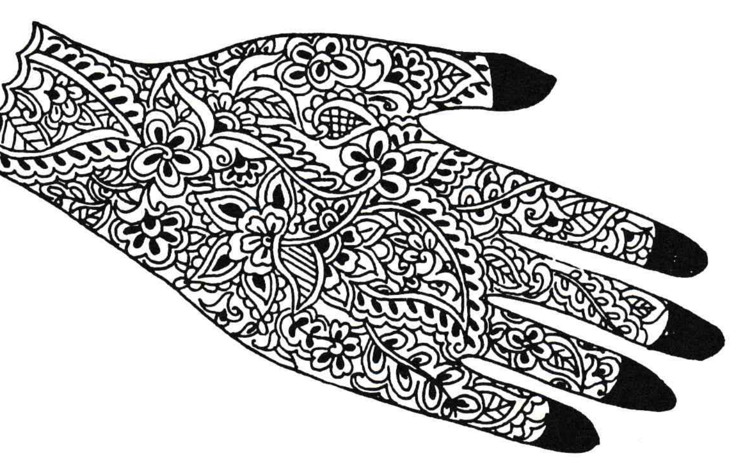

ON BEING A BENGALI IN CANADA

RANEN SINHA

People have migrated from one place to another from the early days of human civilization. There is nothing new in it. When times are bad, food or shelter are scarce or personal safety is threatened, one packs one's baggage and moves to greener pastures. At other times, powerful nations with large armies invade the weaker ones and conquer them.

The next phase begins with ruling the defeated, super-imposing the conqueror's culture and lifestyle over those of the conquered. As time passes, many of the conquerors settle down among the subject people. So it has been, and perhaps always will be with peoples and nations.

In spite of this ongoing pattern of migration of people, most countries or nations try their best to retain their identity, through preserving their ethnic, cultural and social characteristics. Sometimes, however, such zeal to preserve the ethnic identities becomes an exercise in futility. Geographer Kendall satirically commented on his nation's effort over the centuries to keep Britain "British".

"Once upon a time there was a lot of British people in Britain. But in 449 - the Angles came,

in 477 - the South Saxons arrived,
in 495 - the West Saxons followed them and they began to take Britain over,
in 787 - the Danes came and settled and there was a lot of fighting among immigrants until,
in 1066 - the Normans took us over and pinched all the best jobs,
in 1688 - we even had a Dutch King,
in 1714 - we got a German one (and they stayed on).
There were Huguenot immigrants,
and Dutch weaver immigrants
and the Irish,
and Chinese restaurant-keepers,
and transport workers from Barbados,
.......American businessman,
.......Malaysian nurses,
.......Indian doctors
and they all settle here,
-- and it still goes on!
and on!
SO LET'S KEEP BRITAIN BRITISH".

Countries like Japan have been more successful in this regard. Then, there is the case of modern Brazil where masses of people with very different ethnic, racial and cultural backgrounds are literally melting into one pot. Our ancestral country, India, has been a mosaic of peoples for some time. In fact, when two or more distinct peoples happens to share the same habitat or country, they may remain moderately distinct, live in harmony and become a "mosaic" as Switzerland and Canada. They may blend and become a melting pot as in Brazil and the United States of America. Or, they may remain truly distinct but in conflicts as in Israel and Sri Lanka.

Large numbers of immigrants from India came to Canadian shores, first during 1905-1908 (mostly Sikhs) and during 1961-1975. Most Bengali immigrants in Toronto, Ottawa, Montreal, Winnipeg and elsewhere in Canada came here during the later influx of migrants. A large number of the Bengalis are white-collar workers employed as physicians, engineers, scientists or similar other professions.

Thus it is only now that the Canadian-born second-generation children of Bengali parents are approaching teen-age or adulthood. They are about to face the full brunt of integration process with the mainstream population of this beautiful, multicultural and progressive country. Like many other nationalities who came before us and adjusted to this country, albeit with much trials and tribulations, we are also likely to have a few hurdles ahead.

How to face the challenge positively and without undue pessimism? How to preserve at least parts of our delightful Bengali language, culture and literature? The more ambitious ones amongst us would like to preserve their "ethnic purity" by encouraging their children to marry only amongst the Bengalis. We may avoid much pain and anguish in the future, if we observe what has happened in this regard to the Canadian-born children of other ethnic groups in Canada.

Whether we like it or not, young people in this country marry at their free will. Simply because they fall in love with a <u>person</u>, regardless of their culture and ethnic background. I feel that as first-generation Bengali parents, we should help and empathize with

our sons and daughters in making their own choices, even if it may be contrary to our own traditional Bengali expectations. What is most important and probably also a more pragmatic approach would be to reinforce in them our truly worthwhile Bengali ways and values. Some of these are : our love for literature, poetry and music, emphasis on affectionate brother-sister relationship, commitment to the family, political awareness, free-thinking, and respect for the aged.

In 1985, when the Bengali community in Manitoba had a Think Tank on preserving Bengali heritage, some of our Canadian-born Bengali young people felt that their parents were to protective and not receptive to new and alternate points of views. Although this teen-age reaction to the adults is not restricted to Bengali parents alone, we as parents must be specially sensitive to this type of feeling from our growing children and try to respond as constructively as possible. Failing to meet this challenge with kind and flexible advise, may cause enormous pain and dislocation in otherwise harmonious relationship within a Bengali-Canadian family. In this context one can never emphasize the importance of communication between generations-- one of which is engrossed with the nostalgia of the old country while the other is about to bloom from a plant grown on the different soil substrate of a new country. One parent in Manitoba Bengali Think Tank summed up the main thrust of meeting the challenge this way:

Enlightened parental attitudes and good communication skills will be necessary for the successful continuation of the Bengali way of life in Canada. The approach has to be non-threatening and should consider that our children are growing up in a country different than ours. They may often not see things the same way as we do. Most of all, we should be consistent by having the same standard for us as we have for them, and by setting good behavioral examples. It is important for the children to see us as absorbing what is good in the Canadian way of life (to which they have a greater affinity). This sensitive demonstration of a desire to give and take will encourage greater cooperation on the part of the children in appreciating things whose relevance they may now

question or may not often appreciate.

There is no clear solution to this dilemma of reconciling two very different lifestyles and life views. The following guidelines may be helpful:

1. We must accept that we can not transplant India (Bengal) into Canada. These countries are genuinely different -- culturally, socially, geographically and climatologically, even though English type of educational system and a tradition of parliamentary democracy are common to both countries.
2. We should develop a lifestyle on the basis of the classical value system, such as tolerance, honesty, truth, and enthusiasm for learning. If one cares to look for them, these values are just as often found in Canada as in India; practising these values one may overcome some of the obvious differences (in mores etc.) encountered by living in another country.
3. For our second or third generation children, we should accept that their lifestyle will be a sharp contrast from what we experienced. Given this possibility, we should try to pass on only the essence Bengali lifestyle and life view to them.
4. Because our children are usually intelligent, and themselves quite aware of this dilemma of living with two culture, they should be given our full support at home. Such positive reinforcement will help them sort out on their own the conflicting issues facing them in their day-to-day life. No matter how much we as parents want to solve children's problems, in the final analysis, it is their responsibility. We should trust them to find a balance and peace in their life and accept their choice. We may be surprised at the outcome!

FREEDOM
Protiti Khan

What Freedom means to me .....
Freedom means love and laughter
Of the people around. And when the
Hearts and minds of (little) children
Are at your attention - tell them .....
Tell them about freedom!
Tell them about Places, People,
Things around them.
Then tell them about the unfortunate,
The hunger and the pain
Tell them that they are Free!
But, tell them also that they will not be
Free until they free the others!

SNOW
Protiti Khan

I lay ... to watch the snow
Though I have seen this mindless
Process of beauty before,
I do wonder to its sight;
As the white flowers of
The sky seem to put life
To sleep, and as to prepare
It for the next morning!
Because when life awakens
It never dies.

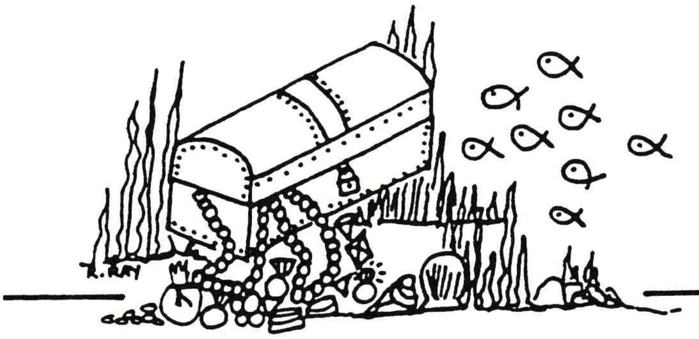

A GIVING SPIRIT

H.V.L.

As the Cadillac owner walked to his car, he saw a boy about 10 years old staring intensely through the windows. Wondering what he was up to, the man put his hands on the youngster's shoulders, pulled gently, and asked him what he was doing. The boy said he was interested in cars and had read a lot about different models. He then told him many details about that particular year and body style.

After a bit, the boy asked, "Mister, how much did you pay for this car?" The man replied, "Nothing. My brother gave it to me." The boy responded, "I wish ..." but stopped in mid-sentence. The man chuckled, "You were going to say, 'I wish I had a brother like that.'" "No, I was going to say, 'I wish I could be a brother like that. You see, sir, I have a brother who is crippled and I'd like to do a lot of things for him."

ME AND MOTHER

TOOKI

THE REPAIRMAN

RANJAN BOSE

I dialled the number with trembling fingers, feeling just like the person who hasn't been to the dentist for years and now must. Someone picked up the phone at the other end bringing me to the point of no return! "Hmm", the professional sounding voice at the other end continued after a very stress - provoking pause, "when did you say your unit was installed?" "Four years ago". And it has never been serviced since then", the voice asked? Sweat poured forth from my forehead, "No, I am afraid not, but, um, you see, it never gave me any trouble". "We will be there next wednesday', 'god' said! I mustered up my last ounce of courage, Could you possibly tell me the time of the day when the repairman will be here"? "Anytime between ten in the morning and four in the afternoon", and the conversation was over.

Wednesday came and as I was getting into the most tricky part of my spreadsheet calculation, the door bell rang. It was the air-conditioner repairman. A jaunty looking man in his mid-thirties. Great weather for golfing, I wish I could take to the greens now", he said as he scowled. I felt guilty, if only it wasn't for my air-conditioner he could be out there putting. Some people have a habit of chatting with their repair men. I leave mine alone. Paying sixty dollar an hour for small talk is not my cup of tea. After 15 minutes of noisy cleaning, the man, hot from 'hard' toil, emerged from the basement and focused his attention on the compressor unit outside. Covers came off and even I was recruited into service. I happily ran in and out turning up or down the thermostat at the beckoning of the Master. Then all of a sudden, the air-conditioner which had never troubled me in the last four years refused to sweat. "Hmm', the repairman muttered. It was my turn to sweat. How many times have I heard that profession expression which inevitably turns on to the $ sign. But I was not giving it easy. " Unit has never given me trouble in the last four years, what could have gone wrong', I squeaked? "Could be your relays or one of the

capacitors", came the reply accompanied by a benevolent smile. A couple of minutes passed and the unit was still dead. Then he touched a relay and the unit came alive only to die as soon as his screwdriver lifted off. "I can't afford that ", gasped I. Then he suddenly had an inspiration, "May be the compressor pump is over heating", and he hosed the unit. The air conditioner started working. "It is working now", the golfer started putting away his tools impatiently. "Please let me try one time just to make sure it will look o.k. When the unit cycles", I begged and ran inside to turn the thermostat up and then down. Sure enough, the blasted air -conditioner was sitting there, its silence mocking me. "Could be the capacitors, y'know", the voice of wisdom pronounced. Suddenly something flashed in my memory. " I just remembered something, I think this unit has a delay built in, so that every time the thermostat settings are changed the unit comes on after four minutes or so".Amused disbelief pouring from his eyes, the repairman asked me if I had an owner's manual. Like a drowning man, clawing from straws, I ran inside and rummaged for the manual. "Here, see it says tat after resetting the thermostat, there is a delay ......", I pleaded. Meanwhile, he had discovered that the current drawn by the unit was 7.8 amperes. Even on my asking him he did not clearly tell me if that was too high or too low or what. Leaning (very) heavily back on principles of physics learned twenty years ago and common sense gained since then, I figured that if the circuit breaker was rated at 30 amperes, a current of 7.8 Amperes could not be all that high. A table in the manual proved me to be right. Having regained my self- confidence, I timed the delay, between changing the thermostat setting and the unit turning on by itself, several times. It indeed was about four minutes. "You must get your unit serviced every year, keeps 'things' in shape", he offered the friendly advice as I wrote out a check for 65 dollars and some odd cents. "You don't see that kind of thermostat a lot, the sucker fooled me with that four minutes delay", he said as he drove away! At least he was honest!

I was talking to my neighbour the other evening, you know, one of those rare across the fence chats. "Do you know much about

cars", he asked? "A little", I replied. "Well you know there is this intermittent gurgling whine which my jalopy sometimes makes on humid days'. I did not waste any time thinking, "sounds like either the relays or one of the capacitors". "Ah", he said and looked relieved. We probably have the same air-conditioner repair man.

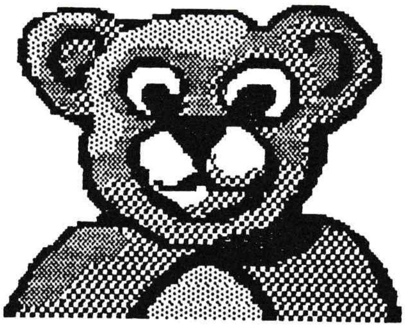

THE LONELY BEAR

NISHAD JABEEN (LINSA)

Once there was a lonely bear. He didn't have any friends except his jungle friends. For this he was very sad. He wanted new friends like kids.The next morning the bear saw two kids. One was a girl and the other was a boy. The girl's name was Kera and the boy's name was Fredy. Kera was 8 years old and Fredy was 10 years old. The bear wanted to be their friends. So he asked if they could be his friends and they said o.k. This made the bear feel very happy.So they had lots of fun together. They went to the zoo, they went to the park, they went to the picnic and also went to the museum together.Kera and Fredy then took the bear to their house to meet their parents.Their mom's name was Catherine and their dad's name was Bart. Catherine and Bart was very pleased to meet the bear. This made the bear feel more happy and he never felt sad again. The bear was so happy that he could cry but he didn't cry. So the bear lived happily ever after with this happy and friendly family. THE END

From: Mom & Dad
September 21, 1990
Winnipeg

Shibdas Biswas

<u>A gift of god</u>

Years of craze and yearning
blessed, a baby born
A gift of god, to be adorn
Smile, laughter, cry day and night
Tossing, singing and shedding tears
Grows the little beauty like my dear
Blend with force and courage outdoing all
Pass eighteen, that's not all ...
Twinkling of her eyes, a mingling of her smile
and some grumbling face
Filled the 18 years, like the other day, what a grace!
Pass eighteen, out you grown
No change, wherever you go,yet my own
Care and love, as it was
Remains blessed, the maiden born
O H lord, a gift of God,
a baby born.

MOSAIC: made my day at last.......

Shibdas Biswas

(1)

The lines, I write take me to past
Young I was, fearless, stumbled on my way
Fell and rose, never turned back, made my day at last.......
The land I chose, made me weary
Never repented, made my way at last....
In search of knowledge, inundated with desire
Cometh the lad, never looked back, made my day at last.......

(2)

Values I carry is not the matter of the past
It is in my heart, continue to remind me of the past, made my day at last.......
Care and share, be one with others
Thats what I want to pass on to others
Foods, clothes and rituals, not different from others
Together that makes "mosaic", made my day at last.......
Dance and music is in my blood
It is to be cherished, pass on to others like a flood
Together that makes the mosaic, made my day at last.......

(3)

Our women and children need to be cared
Help them feel, the land they live, nothing to scare
Together that makes the mosaic, made my day at last.......
Let them choose with the values in mind
Held your hand as they stumble and grind
That makes the mosaic, made my day at last.......

(4)

Youth carrying the banner of tomorrow
Let them learn to live and share
Together that makes the mosaic, made my day at last.......
Care and share, be one with others
Thats what I want to pass it to others
Makes the mosaic, made my day at last....
No more hatred, discrimination away
Thats the youth to be, we know of today
Together that makes the mosaic, made my day at last....

(5)

Equal opportunity, faith in the system
That shall grow without any fear in each custom
Together that makes the mosaic, made my day at last....
Live and let live with hope and share
That is Canada, a land we are here
Held your hand, let not stumble
That makes the mosaic, made my 'stay' at last....